বুনিয়াদী শিক্ষায় সংগঠন

শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত এম. এ.

বুনিয়াদী শিক্ষার সংগঠন

শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত এম, এ

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৯,

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ : ১৩৬০

প্রকাশক :
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা

মুদ্রাকর :
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস লিমিটেড
১৫এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড
কলিকাতা ৬

দাম : তিন টাকা

যাঁরা নঈ তালিমের কর্মীরূপে শিক্ষার মাধ্যমে বিকেন্দ্রিত শোষণহীন সমাজ-গঠনের কাজে ব্রতী সেইসব পরমাত্মীয়দের হাতে এই বইখানি তুলে দিলাম।

অনিলমোহন গুপ্ত
১১।১১।৫৩

ভূমিকা

বুনিয়াদী শিক্ষা নামটা আমাদের যত পরিচিত নঈ তালিম নামটা তত নয়। গান্ধীজী এক নূতন সমাজের আদর্শ সামনে রেখে আমাদের কাছে সারাজীবনব্যাপী এক শিক্ষার পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছিলেন। উৎপাদনাত্মক কর্মের মাধ্যমে জীবনব্যাপী এই শিক্ষার নাম তিনি দিয়েছিলেন নঈ তালিম বা নূতন শিক্ষা। আমাদের দেশে যে চালু শিক্ষাব্যবস্থা রয়েছে তা স্বাধীনজাতির সৎ নাগরিক গড়ার পক্ষে যোগ্য নয়। নূতন শিক্ষা বর্তমানের এই অযোগ্য শিক্ষার স্থান গ্রহণ করবে এই ছিল তাঁর আশা।

দেশ স্বাধীন হয়েছে। দেশের শাসনরশ্মি আমরা নিজের হাতে গ্রহণ করেছি। গান্ধীজীকে আমার জাতির জনক বলে উল্লেখ করে থাকি এবং তাঁর আদর্শকে রূপায়িত করার কথাও চিন্তা করে থাকি। কিন্তু আমাদের অবস্থার আশানুরূপ পরিবর্তন হয়নি।. যেটুকু হয়েছে তাও মূলতঃ স্বাধীনতার যোদ্ধাদের স্বপ্নের পরিপন্থী বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। নূতন নূতন পরিকল্পনার জন্য, দেশকে সর্বতোভাবে গড়ে তোলার জন্য সরকার অজস্রধারে অর্থব্যয় করছেন। জনসাধারণ বর্তমান অসহনীয় অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য করুণভাবে আর্তনাদ করছেন। বিশেষজ্ঞদের আনাগোনার অন্ত নেই। অথচ সর্বনাশের অজগর যেন জাতিকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে।

কেন এই ব্যর্থতা? কেন আজ দেশের যুবশক্তি বারবার আক্রোশে ফুলে ওঠে? কেন আজ দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেবার কথা দেশের প্রধান মন্ত্রীর কণ্ঠে ভাষা পায়? কেন আজ দেশের জনসাধারণ কর্মের উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে না?

জনসাধারণকে অজ্ঞ আর ছাত্রদের বিভ্রান্ত বলে তিরস্কার করলে এ সমস্যার সমাধান জুটবে না। ইংরেজের পাঠশালায় যে চোখে আমরা দেশকে, দেশের সমস্যাকে দেখতে শিখেছি সে চোখের কালো চশমা আজও খসে পড়েনি, আজও নূতন শিক্ষার আলোকে আমাদের দৃষ্টিপথ উদ্ভাসিত হয়নি।

বিদ্যালয়ে আজ চরিত্র গঠিত হয় না, বুদ্ধিকে শাণ দেওয়া হয় মাত্র। শত শত ভাবে সর্বকাজে ফাঁকি দেবার পথ তৈরী করে আমরা সেই শাণিত বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছি। আজ যদি মঙ্গলকর্মে সেই বুদ্ধিকে নিয়োজিত করা না যায় তবে সে দোষ কার ?

দেশের নেতাদের দেখে দেশের জনসাধারণ শেখে। দেশের সমাজের উপরতলায় আজও ভোগের স্রোত অপ্রতিহত গতিতে বয়ে চলেছে। আজও সমাজের উঁচু ধাপে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে জনসাধারণের অপরিসীম ব্যবধান। আজ যদি উপরতলার নেতাদের ডাকে জনসাধারণ সাড়া না দেয়,আজ যদি ভোগস্ফীত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের আহ্বানে রিক্ত জনসাধারণ ত্যাগের, তপস্যার, দেশপ্রেমের পথে এগিয়ে না আসে তবে সত্যই কি তাদের দোষ দেওয়া চলে ?

গান্ধীজী নঈ তালিমের আদর্শকে সামনে রেখেছিলেন সকলের জন্য। সকলকে শিক্ষা নিতে হবে ; এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে সকল শিক্ষার্থী পাবে কর্মের প্রেরণা,ত্যাগের দীক্ষা। এ কেবল শিশুদের জন্য নয়, বৃদ্ধেরও জন্য কেবল জনসাধারণের জন্য নয়, নেতাদেরও জন্য।

সরকার বুনিয়াদী শিক্ষার উৎকর্ষ স্বীকার করেছেন—সমগ্র নঈ তালিমকে গ্রহণ করেননি। এ ব্যবচ্ছেদ আত্মঘাতী। জনসাধারণও সাধারণতঃ সরকার গৃহীত এই শিক্ষাব্যবস্থারই সমালোচনা করে

বুনিয়াদী শিক্ষার সংগঠন

স্বাধীন ভারতের শিক্ষা-সংস্কার

এক

ভাদ্রের 'শনিবারের চিঠি'তে শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ্র "স্বাধীন ভারতে শিক্ষাসংস্কার" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন—কোন্ পথে আজ দেশ এগিয়ে যাবে, কোন্ আদর্শকে সামনে রেখে আজ জাতিকে গড়ে তোলা হবে, এক কথায় কোন্ পথে কি ভাবে চলার শিক্ষা আজ দেশকে দেওয়া হবে তা ঠিক করার দায়িত্ব আমাদেরই। শিক্ষা যে জীবন-দর্শন, সমাজ-দর্শন বা রাষ্ট্র-দর্শনকে জাতির মধ্যে সঞ্চারিত করার বাহন—এ কথা আজ কারও অজানা নয়, শিক্ষার মধ্য দিয়েই ফ্যাসিস্ট, বা কমিউনিস্টিক বা গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী আজ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সঞ্চারিত করা হচ্ছে। আমাদেরও যদি দাসজাতিকে নূতন আদর্শে, নূতন প্রেরণায় সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে হয়, নূতন পথে প্রগতিশীল জগতের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলবার মত শক্তি জাতির মধ্যে সঞ্চারিত করতে হয়, তবে নূতন ক'রে উপযুক্ত শিক্ষার কথা ভাবতে হবে। এতদিন চিন্তা ও কাজের মধ্যে বিরাট্ প্রাচীর ছিল পরাধীনতার। নিজেদের কোন পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করা সুকঠিন ছিল, যদি তা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের পরিপন্থী হ'ত। আজ একমাত্র পারিপার্শ্বিক

অবস্থা ও বহু শতাব্দীর স্তূপীকৃত নিজেদের পাপ দিয়ে গড়া বাধা ছাড়া আর কোন বাধা নেই। অর্থাৎ আজ বাধাটা আর বাইরের নয়, ভেতরের। ভেতরের বাধা ব'লে বাধাটা যে কোন অংশে কম শক্তিশালী, তা নয়। বরং এতদিন চেনা শত্রু ছিল, তাই শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা ছিল সহজ; অন্তত শত্রুকে চিনে নেবার জন্য বেগ পেতে হ'ত না। আজ বাধা আমাদের ভেতরে, আজ বাধা আমাদের অবচেতন মনে, আজ বাধা আমাদের যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত সংস্কারের, আজ বাধা আমাদের নিজেদের বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গীর। তাই এই অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করা আরও কঠিন। কিন্তু বাধা যতই কঠিন হোক না কেন, আজ কাজের দায়িত্ব আমাদেরই, ফলাফলের জন্য এবার আর নন্দ ঘোষের ঘাড়ে দোষ চাপানো চলবে না। তাই আজ পথ বেছে নেবার আগে ভাববার প্রয়োজন খুবই বেশি, আর পথ ঠিক ক'রে নিয়ে দৃঢ়পদে এগিয়ে চলার প্রয়োজনও সর্বাধিক।

জাতীয় ভবিষ্যতের ওপর শিক্ষার বিরাট্ প্রভাবের কথা স্মরণ ক'রে আমাদের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ইংরেজ আমলে ইংরেজের প্রয়োজনে যে শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল, পরাধীন দেশে বশ্য দাস সৃষ্টি করার জন্য যে ব্যবস্থা আমাদের ঘাড়ের ওপর চাপানো হয়েছিল, স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ গড়ার জন্য সে ব্যবস্থা যথাযোগ্য ব্যবস্থা হ'তে পারে না। আজকের শিক্ষা আমাদের দৃষ্টিকে পাঠ্য পুঁথির মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে দিয়েছে—বিরাট্ বিশ্বের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে, নিজের আত্মশক্তির ওপর নির্ভর ক'রে সমস্যার সমাধানের শিক্ষা দেয় নি। দাসসৃষ্টির জন্য এমন

ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। পরের কথা নির্বিচারে বিশ্বাস করা এবং তাকে স্থানে অস্থানে উদ্গীরণ করাকে লজ্জার কারণ ব'লে মনে না করার মধ্যেই দাসত্বের বীজ নিহিত রয়েছে। আজ জাতীয় জীবনের নূতন অবস্থায় এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন অস্বীকার্য।

এজন্য শিক্ষা-বিষয়ক চিন্তার প্রয়োজন আজ খুবই বেশি। নারায়ণবাবুর প্রবন্ধকে এজন্য আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলা ভাষায় ভবিষ্যৎ শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কমই হয়েছে, আর যাও হয়েছে তা বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার ছায়ায় আবছা। আমরা এখনও বর্তমানকে পেছনে ফেলে সম্পূর্ণভাবে বিপ্লবী কিছু ভাবতে পারছি না। নারায়ণবাবুর প্রবন্ধ প'ড়েও আমার মনে হয়েছে যে, তিনি কেবল সংস্কারের কথাই কয়েছেন, বিপ্লবের কথা ভাবেন নি। বর্তমান সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোতে বর্তমানে সংস্কারের বেশি কিছু সম্ভব কি না—এ প্রশ্ন উঠতে পারে। সে প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করব না। কাপড়টা যখন পরার যোগ্য থাকে, তখন তাতে দু-চারটা জোড়াতালি দিয়ে তাকে ব্যবহারযোগ্য ক'রে তোলা চলে, কিন্তু জোড়াতালি দিতে দিতে পুরানো কাপড়কে আবার একটা নূতন কাপড়ে পরিণত করার কথা আমরাও চিন্তা করি কি? আমার ধারণা, শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা সেই রকম একটা অসম্ভব কিছু ভাবছি। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা দাসসৃষ্টির ব্যবস্থা। একে জোড়াতালি দিয়ে আরও ভাল দাসসৃষ্টির ব্যবস্থায় পরিণত করা চলে, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। স্বাধীন মানুষ গড়ার জন্য

সম্পূর্ণ নূতন ব্যবস্থারই দরকার। কাপড় যখন ছিঁড়ে পরার অযোগ্য হয়ে ওঠে, তখন সেটা ফেলে দিয়ে নূতন কাপড় পরাই বিধি। দাসগড়ার শিক্ষা আমরা ফেলে দিতেই চাই, আর তার পরিবর্তে সম্পূর্ণ অন্য প্রয়োজনে নূতন ব্যবস্থা গ'ড়ে তুলতে হবে।

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক পরিকল্পিত বুনিয়াদী-শিক্ষা-ব্যবস্থা এমনিতর একটি নূতন ব্যবস্থা। আজকাল আমরা যাকে গান্ধীবাদ বলি, তা একটা সম্পূর্ণ বিপ্লবী চিন্তাধারা। পাশ্চাত্য সভ্যতা এগিয়ে চলতে চলতে আজ একটা অপরিহার্য পরিণতির সামনে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এই সভ্যতার ভিত্তি সম্পত্তিবোধের ওপর, এ বোধকে যে ইন্ধন যোগায় সে হচ্ছে লোভ। কোন তৃপ্তি নেই এই বোধের; নিত্য নূতন অভাব সৃষ্টি করা আর যে-কোন উপায়ে তাকে তৃপ্ত করার মধ্য দিয়েই এর বিকাশ। এ সভ্যতায় ব্যক্তি ও সমাজের মান হচ্ছে বস্তু-সম্পদের প্রাচুর্য আর এর পথ হচ্ছে হিংসাসিক্ত দ্বন্দ্বের পথ, তাই এর পরিণতি আত্মধ্বংসে। গান্ধীজী বিশ্বব্যাপী এই সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন নূতন পথের সন্ধান দিয়ে। সম্পূর্ণ নূতন ব'লে কোন জিনিসই জগতে নেই, সুতরাং সে অর্থে নূতন বলছি না। যা আমাদের মধ্যে নেই, কখনও ছিল না—এমন একটা কিছুর কথা যদি গান্ধীজী বলতেন, তবে তা অবাস্তব হ'ত। শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর মত গান্ধীজী সেই সত্যকেই আবিষ্কার করেছেন, যার অফুরন্ত দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে, অথচ আমাদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণাতেই আমরা শান্তি, সত্য, ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা দেখতে চাই। অশান্তির পথ

বেয়েও আমরা পৌঁছাতে চাই শান্তির দেউলে, হিংসার সংঘাতের মধ্য দিয়ে আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই প্রেমেরই। পশুত্বই শুধু মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি নয়, মনুষ্যত্বও মানুষের সহজাত; আর পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে উত্তরণই তার বিবর্তনের নিদর্শন। গান্ধীজী এই সনাতন সত্যেরই সন্ধান নূতন ক'রে দিয়েছেন মাত্র। তবু এ পরিকল্পনা নূতন এই জন্যই যে, আদর্শ হিসাবে সত্য, অহিংসা ইত্যাদিকে স্বীকার করলেও বর্তমানের জটিল জীবনযাত্রায় সমাজে, রাষ্ট্রে, শিক্ষায় এর প্রয়োগ আমরা অবাস্তব ব'লে ধ'রে নিয়েছি। এ ধারণার কারণ আমাদের শিক্ষা। আমরা সত্যকে সর্বাবস্থায় আঁকড়ে ধরার শিক্ষা পাই নি, এর ওপর কল্পিত দুর্বলতা আরোপ ক'রে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেবার শিক্ষা গ্রহণ করেছি। চরিত্রগঠন আমাদের শিক্ষার আদর্শ ছিল না। গান্ধীজীর মতে চরিত্রগঠনই শিক্ষার লক্ষ্য, আর বুনিয়াদী শিক্ষা গান্ধীজীর আদর্শ অনুযায়ী চরিত্র ও সমাজ গঠনেরই মাধ্যম।

আমি এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই বুনিয়াদী শিক্ষাকে দেখে থাকি। এই দৃষ্টি নিয়ে দেখতে গিয়ে নারায়ণবাবুর উক্ত প্রবন্ধে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর কতকগুলি উক্তির সঙ্গে একমত হতে পারি নি। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য জানাবার জন্যই এই প্রবন্ধ লিখতে বসেছি।

প্রথমত নারায়ণবাবু বলেছেন, "তিনি (গান্ধীজী) বলিয়াছিলেন, বুনিয়াদী শিক্ষা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা, গ্রামবাসীর শিক্ষা।"

বুনিয়াদী শিক্ষা নিশ্চয়ই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা। অবশ্য প্রাথমিক স্তর বলতে কেউ যেন না আজকালকার উচ্চ-প্রাথমিক

বিদ্যালয়ের স্তর বোঝেন। এখানে জীবনে প্রবেশের এবং নাগরিক দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যতটুকু শিক্ষা অপরিহার্য, তাকেই গান্ধীজী প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা বলেছেন। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষাকে কেবল গ্রামবাসীর জন্য উদ্দিষ্ট শিক্ষা ব'লে আখ্যা দেওয়া চলে না। নারায়ণ-বাবুর এই সিদ্ধান্তের কারণ কয়েকটি বাক্য পরেই পাচ্ছি। তিনি লিখেছেন, "কাজেই গ্রামবাসীকে গ্রামে রাখিয়াই স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-যাপনে শিক্ষিত করা এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি ও কুটিরশিল্পে আত্মনিয়োগ করিতে শিক্ষা দেওয়াই বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য।" সত্যিই যদি বুনিয়াদী শিক্ষার এই উদ্দেশ্য হ'ত, তবে এ শিক্ষা শুধু গ্রামবাসীর শিক্ষাই হ'ত সন্দেহ নেই। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য গান্ধীজী স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, "To draw out the best in the child—physical, intellectual and spiritual" —অর্থাৎ এ শিক্ষা হচ্ছে প্রত্যেকটি শিশুকে দেহে মনে আত্মিক-সম্পদে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত ক'রে তোলার শিক্ষা। তাই শহর-গ্রামের সীমারেখা দিয়ে এর গণ্ডি টানা চলে না। গান্ধীজী বিকেন্দ্রীত শাসন ও শিল্প-ব্যবস্থা চেয়েছেন গ্রামকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নয়, মনুষ্যত্বকে তার চরম বিপর্যয় ও আত্মধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্য। যদি মানুষের বিকাশের জন্য গ্রামকে লুপ্ত ক'রে দেওয়া আর শহর গ'ড়ে তোলা শ্রেয় হ'ত, তা হ'লে গান্ধীজী নিশ্চয়ই তা করার চেষ্টা করতে দ্বিধা করতেন না। এখানে গ্রাম বা শহর প্রধান বিবেচ্য নয়, মূল লক্ষ্য হচ্ছে মনুষ্যত্ব। কেন্দ্রীভূত শিল্প শক্তিকে কেন্দ্রীভূত ক'রে ব্যক্তিকে অসহায়ভাবে পরনির্ভরশীল ক'রে তোলে, উৎপাদনকে যান্ত্রিক ক'রে উৎপাদনকারীর ব্যক্তিত্বকে শিল্পপ্রতিভাকে বিকশিত হবার

সুযোগ দেয় না। এই ব্যবস্থায় সমাজ ও ব্যক্তির বিকাশ পরস্পর-বিরোধী হয়। তাই গান্ধীজী বলেছেন, "কিন্তু আমার মতে যন্ত্রশিল্পের মধ্যেই দুর্নীতি নিহিত আছে, সমাজ-তান্ত্রিকতা তার মূলোৎপাটন করতে পারবে না।"

'বুনিয়াদী শিক্ষা সূতাকাটা, কৃষি, সাফাই, কুটিরশিল্প প্রভৃতির মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে। এ থেকেই হয়তো শিক্ষিত লোকেরা সিদ্ধান্ত ক'রে থাকেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষা চাষাভুষোর জন্য পরিকল্পিত শিক্ষা, ভদ্রলোকের জন্য নয় ; গ্রামের লোকের জন্য পরিকল্পিত শিক্ষা, শহরের লোকের জন্য নয় ; পশ্চাৎপদ জাতি ও সমাজের জন্য পরিকল্পিত শিক্ষা, প্রগতিশীল জাতি বা সমাজের জন্য নয়। বস্তুত আমরা, যারা বিনা বিচারে এমনিতর সিদ্ধান্ত ক'রে বসি, তারা, আমাদের অজ্ঞতাপ্রসূত ক্ষীণ দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে গিয়ে গান্ধীজীর বিরাট্ প্রতিভাকে অসম্মান করি। গান্ধীজী যে শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের সামনে রেখেছেন, তা তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারাকে মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করারই যোগ্য মাধ্যম। তাঁর জীবনদর্শন যেমন কেবলমাত্র অসহায় পশ্চাৎপদ জাতির জন্য নয়, তা যেমন আত্মধ্বংসী সভ্যতার গর্বান্ধ মূঢ় পদক্ষেপের সামনে মঙ্গলের এক নূতন পথরেখা, তেমনই তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থাও সর্বদেশের সর্বজাতির জন্য। কিন্তু বাস্তব অবস্থাকে গান্ধীজী ভাল ক'রেই চিনতেন, কারা তাঁর উপদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবে তা তিনি জানতেন ; তাই তিনি এই শিক্ষার পরীক্ষাকে গ্রামের সীমারেখার মধ্যে প্রয়োগ করার উপদেশ দিয়েছিলেন।'

বুনিয়াদী শিক্ষায় সূতাকাটা, কৃষি ইত্যাদি কাজের শিক্ষা বৃত্তি-

শিক্ষা নয়। বুনিয়াদী শিক্ষালাভের পর সবাই তাঁতী বা চাষী হবে, এ কল্পনা নিশ্চয়ই গান্ধীজীর মনে ছিল না। বুনিয়াদী শিক্ষার এই মাধ্যম গ্রহণ করার কারণ ত্রিবিধ। কাজের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ যে সব চাইতে কার্যকরী এ সম্বন্ধে আজ আমাদের কোন সন্দেহ নেই, কারণ মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞান এ সম্বন্ধে আমাদের সামনে অকাট্য যুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থাপিত করেছে। কিন্তু সব কাজই কি শিক্ষাদানের পক্ষে সমান উপযোগী ? গান্ধীজী শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে তেমন কাজই বেছে নিতে চেয়েছেন,

(১) যা আমাদের জীবনধারণের অপরিহার্য বিষয়ে স্বাবলম্বন এনে দেবে, যার ফলে উত্তর-জীবনে আমরা যখন সমাজের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে চলব, তখন তা ছদ্ম দাসত্ব হবে না, আত্মরক্ষার শক্তিসম্পন্ন শক্তিমানদের মধ্যে স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা হবে ;

(২) যে কাজ কেবল মাত্র শিশুর ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশিকেই পরিতৃপ্ত করবে না, পরন্তু সামাজিক মঙ্গলকে এগিয়ে দেবে, যার ফলে শিশুর মধ্যে সমাজ-বোধ জাগ্রত হবে, সামাজিক মঙ্গল ও আত্ম-বিকাশের চিন্তার মধ্যে সেতু রচিত হবে ;

(৩) যে কাজের ব্যাপকতা এত বেশি, যে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সেই কাজগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ হবে।

সকল কাজের এই গুণ নেই। তাই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গান্ধীজী পরিচ্ছন্নতা ও অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান সম্পর্কিত কাজগুলি বেছে নিয়েছেন। এই কাজগুলিতে যদি আমরা অসহায়ভাবে পরনির্ভরশীল হই, তবে আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা একান্তভাবে ব্যাহত হতে বাধ্য। আমাদের সহযোগিতা তখনই স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা হতে পারে

যখন আমরা এই সব একান্ত অপরিহার্য কাজ সম্বন্ধে অসহায়ভাবে পরনির্ভরশীল থাকি না। কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে পারে না। আত্মনির্ভরশীলতা যতই বাড়বে, আমাদের স্বাধীনতাও ততই ব্যাপক হবে, ততই তার ভিত্তি দৃঢ় হবে। সুতরাং এই কাজগুলির শিক্ষা আমাদের স্বাধীনতার উপযুক্ত ক'রে তুলবে ব'লেই এই কাজগুলির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়।

অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান সম্পর্কিত কাজগুলি প্রায়শ কারুশিল্প। এদের একটা মূল্যের দিকও আছে। তাই কাজগুলি নেহাতই ভাঙা-গড়ার খেলা নয়। এ কাজগুলি যত ভাল হবে, শিক্ষা ও নিপুণতা যতই পূর্ণ হবে, ততই উৎপাদিত দ্রব্যগুলির মূল্য বাড়বে। সুতরাং এই কাজগুলির শিক্ষা কেবলমাত্র শিশুকেই সৃষ্টির আনন্দ দেবে না, সমাজের ঐশ্বর্য বাড়াতেও সাহায্য করবে। এ ভাবে এই কাজগুলির মধ্যে ব্যক্তিগত আনন্দ, ব্যষ্টির বিকাশের সঙ্গে সমাজের মঙ্গল, সমষ্টির বিকাশও একীভূত হয়ে আছে।

শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে এই কাজগুলিকে নির্বাচন করার প্রধান কারণ হচ্ছে পূর্বোলিখিত তৃতীয় কারণটি। জীবনের পক্ষে অপরিহার্য এই কাজগুলির ব্যাপকতা অসীম। আমাদের জীবনের প্রতি ক্ষণকে, আমাদের ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠাকে প্রভাবিত করেছে এই কাজগুলি, এজন্য শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে এই কাজগুলির কোন তুলনা নেই।

বুনিয়াদী শিক্ষা যে কেবলমাত্র গ্রামবাসীর শিক্ষার পরিকল্পনা নয়, তার একটি প্রমাণ হচ্ছে এজন্য নির্বাচিত নামটি। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা 'বুনিয়াদী জাতীয় শিক্ষা' (Basic National Education)

ব'লে পরিচিত। এখানে 'জাতীয় শিক্ষা' কথাটার অর্থ ভাল ক'রে বোঝা উচিত। প্রত্যেক জাতির জাতীয় ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান ও ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি ক'রে সেই জাতির প্রতিভা রূপ নেয়। বিশ্বের ভাঁণ্ডারে এই হয় জাতির সব চাইতে বড় অবদান। ভারতের প্রতিভা রূপ নিয়েছে সত্য ও অহিংসার বাণীতে। সত্যকেই ভারত ভগবান ব'লে জেনেছে, ধর্ম ব'লে গ্রহণ করেছে। তাই ভারতের ধর্ম কথার আড়ালে বাঁধা পড়ে নি। যা-কিছু সত্য, যা-কিছু মঙ্গলকর, ভারত তাকেই গ্রহণ করেছে, আপন ক'রে নিয়েছে। দ্বন্দ্বের পথ থেকে সামঞ্জস্যের পথে চলতে ডাক দিয়েছে ভারতবর্ষ। বুনিয়াদী শিক্ষা ভারতের এই বাণীকে, এই প্রতিভাকে, এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে রূপ দেবার মাধ্যম হবে, এজন্যই একে জাতীয় শিক্ষা বলা হয়েছে। সুতরাং 'জাতীয় শিক্ষা' কথাটা একটা ভৌগোলিক সীমা নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত হয় নি, একটা জাতীয় প্রতিভার দ্যোতক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

জগতে চিরকালই গ্রাম আর শহর থাকবে, ছোট-বড় শিল্প থাকবে। সমস্ত গ্রামকে আমরা শহর ক'রে ফেলব অথবা সমস্ত শহরকে অবলুপ্ত ক'রে আমরা খাঁটি গ্রামসভ্যতার পত্তন করব—এ কোন কালেই সম্ভবপর হবে না। কিন্তু গ্রামে শহরে সর্বত্রই সত্যনিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা, আত্মনির্ভরতার মনোভাবকে সঞ্চারিত করা সম্ভব। বুনিয়াদী শিক্ষা এই সম্ভাবনার ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। বস্তুটা তো কেবলমাত্র বস্তু হিসাবে দোষণীয় নয়; তার সৃষ্টির পেছনে যে মনন-শক্তি আছে, তার ব্যবহারের পেছনে যে ব্যক্তিত্ব কাজ করছে, তারই প্রভাবে বস্তুর মূল্য প্রভাবিত হয়। এই মনন-শক্তি,

এই ব্যক্তিত্বকেই নূতন ক'রে গ'ড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়ে।

দ্বিতীয়ত, নারায়ণবাবু লিখেছেন: "বুনিয়াদী শিক্ষার প্রধান সমালোচ্য বিষয় এই যে, নিম্ন হইতে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত একটি সুসম্বদ্ধ শিক্ষাপ্রণালীর অঙ্গহিসাবে ইহা প্রথম হইতেই পরিকল্পিত হয় নাই।"

শ্রীযুক্ত চন্দ্রের এই মন্তব্য সম্পূর্ণ সত্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু এ বুনিয়াদী-শিক্ষা-পরিকল্পনার দোষ, না, গুণ, নূতন পরিকল্পনার দুর্বলতা, না, শক্তি? আমরা যখন সুসম্বদ্ধ শিক্ষাপ্রণালীর কথা ভাবি, তখন আমাদের বর্তমান জ্ঞান দিয়েই তার সীমারেখা টানি না কি? যা অজানা, যা সম্পূর্ণ নূতন, তার সবটা আমরা দেখব কি ক'রে? তার সম্পূর্ণ চিত্র আঁকা কি ক'রে সম্ভব হতে পারে? আমরা নূতনের আকাঙ্ক্ষা করি বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন কিছু গ্রহণ করা আমাদের শক্তিতে কুলিয়ে ওঠে না। আমাদের ভীরু পদক্ষেপ, ঝাপসা দৃষ্টির ফলে নূতনের সঙ্গে অনেকখানি পুরাতনের খাদ মিশিয়ে ফেলি। এইখানেই আমরা পেতে পারি গান্ধীজীর বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয়। ফলাফল দেখার জন্য ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করার মত বৈজ্ঞানিক মনোভাব তাঁর ছিল, তাই তিনি আগেভাগেই একটা সুসম্বদ্ধ শিক্ষাপ্রণালীর কাঠামো গড়েন নি। প্রাথমিক স্তরের কাজ আরম্ভ করার জন্য তার একটা রূপ দেবার প্রয়োজন ছিল, বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনায় ততটুকু মাত্র রূপ দেওয়া হয়েছিল; আর ততটুকু সম্বন্ধেও বার বার সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়েছিল যে, এর কোন কিছুই শেষ কথা নয়। যে সম্বন্ধে কোন সংশয় ছিল না, তা হচ্ছে

আদর্শ ও পথ সম্পর্কে। উৎপাদক কাজের মাধ্যমে স্বাবলম্বী শিক্ষার কথাটা তাই গান্ধীজী এত জোর দিয়ে বলেছেন। তিনি বলেছেন :—'Self-sufficiency is the acid test of its reality"—এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হ'লে শিক্ষার বিষয়বস্তু কি হবে, কত বৎসর ব্যাপী শিক্ষা দেবার প্রয়োজন হবে, সে সম্বন্ধে শেষ কথা গান্ধীজী কিছুমাত্র বলেন নি। কিন্তু শিক্ষার ব্যাপ্তি বা বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, এ শিক্ষা সার্বজনীন হওয়া চাই, অবৈতনিক হওয়া চাই, আর মাতৃভাষার মাধ্যমে হওয়া চাই। এই নীতির মধ্যে কোন অস্পষ্টতা ছিল না। শিক্ষা তৈরি করবে নূতন যুগের নূতন মানুষ, আর প্রত্যেকের অধিকার থাকবে মানুষের মত মানুষ হয়ে গ'ড়ে ওঠার। মহাত্মাজী নূতন বোতলে পুরানো মদ ঢালার চেষ্টা করেন নি, একটা জোড়া-তালি দেবার ব্যবস্থা করেন নি। আজ বুনিয়াদী শিক্ষার ফলাফল আমাদের হাতে রয়েছে, তারই ভিত্তির ওপর মাধ্যমিক এবং ওই পরীক্ষার শেষে তার ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চতর শিক্ষার কথা আমাদের ভাবতে হবে। গান্ধীজী যে প্রাথমিক স্তরের পরীক্ষা শেষ হবার আগে উচ্চতর স্তরের শিক্ষা-পরিকল্পনা ইচ্ছা ক'রেই রচনা করতে চান নি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে সেবাগ্রামে হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘের Post-Basic Sub-Committeeর অধিবেশন হয়। উক্ত উপ-সমিতি মাধ্যমিক শিক্ষার এক বিশদ পরিকল্পনা রচনা করেন। এই পরিকল্পনা গান্ধীজীর কাছে উপস্থাপিত করা হ'লে তিনি বলেন যে, 'হাওয়াই বাত' তিনি চান না। তাঁর সামনে প্রাথমিক শিক্ষার যে ফলাফল রয়েছে, তার ভিত্তিতে উক্ত প্রাথমিক

স্তরের শিক্ষা যারা সম্পূর্ণ করল, তাদের শিক্ষাকে এগিয়ে নেবার জন্য কি শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত, সে সম্বন্ধে ভাবতে তিনি এই উপ-সমিতিকে উপদেশ দেন। এই শিক্ষার নাম মাধ্যমিক শিক্ষা হবে, না, কলেজী শিক্ষা হবে—এ নিয়ে বিতর্ক করা নিরর্থক ব'লে তিনি মনে করেন। এ শিক্ষা নূতন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ, পুরাতন নামের সঙ্গে যুক্ত করার অত্যধিক আগ্রহে কেবল ভ্রান্তিরই সৃষ্টি হবে। সুতরাং আমার মনে হয়, বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা যে প্রথম থেকেই একটা সুসম্বদ্ধ শিক্ষাপ্রণালীর অঙ্গ হিসাবে তৈরি হয় নি, এখানেই তার বৈশিষ্ট্য। সার্জেণ্ট-পরিকল্পনা আমাদের সামনে একটা সুসম্বদ্ধ শিক্ষাপ্রণালীর পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছে। আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টিও সহজেই আকৃষ্ট করেছে এই পরিকল্পনা, কারণ এই পরিকল্পনাতে নূতনত্ব থাকলেও পরিকল্পনাটি মূলত আমাদের বর্তমান শিক্ষার কাঠামোর সঙ্গে বেমানান নয়। এজন্য আমরা সহজেই একে গ্রহণ করতে পারি, বিচার করতে পারি। আমার মনে হয়, সংস্কার আর বিপ্লবের মধ্যে এখানেই তফাত। সার্জেণ্ট-পরিকল্পনার চেষ্টা আমাদের বর্তমান শিক্ষাকে সংস্কারের চেষ্টা, গান্ধীজীর চেষ্টা বিপ্লবের।

তৃতীয়ত, নারায়ণবাবু লিখেছেন, "পল্লীর বালকবালিকাকে যদি আবশ্যিক ভাবে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সাত বৎসরকাল শিক্ষা লাভ করিতে হয়, তবে তাহার ফলে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হইতে সক্ষম ভাবী প্রতিভাকে আমরা পাকা কারিগরে পরিণত করিয়া তাহার বৃহত্তর প্রতিভার বিকাশে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি

করিতে পারি।" এই আশঙ্কাকে দূর করার জন্য নারায়ণবাবু একটি উপায়েরও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন: "...শুধু সকল ছাত্রকেই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শেষ শ্রেণী পর্যন্ত ধরিয়া না রাখিয়া প্রতিভাবান কতককে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে।" অর্থাৎ তাঁর মতে ১১ বৎসর বয়সের পর প্রতিভাবান ছেলেমেয়েকে উচ্চশিক্ষার দিকে যেতে দেওয়া উচিত।

তাঁর এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে পারি নি। সাত বছর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাটালে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হওয়ার বিঘ্ন ঘটেছে, এমন কোন প্রমাণ আছে কি? বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাজ শেখার মানে বৃত্তিশিক্ষা নয়—এ কথা পূর্বেই বলেছি। এখানে কাজকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়, এই কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশ ঘটবে ব'লে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বিষয়জ্ঞান কম দেওয়া হয়—এ বোধ হয় আজকালকার সুধীসমাজের ধারণা। এ ধারণা কোন প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত ব'লে মনে হয় না। বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যক্রম দেখলেই বোঝা যাবে যে, বুনিয়াদী শিক্ষায় সাধারণ বিদ্যালয়ের চাইতে অনেক বেশি বিষয়জ্ঞান হওয়ার কথা। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা একটি ছোট প্রবন্ধে করা সম্ভব নয়, অন্যত্র আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।* শারীরবিদ্যা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি শেখার পূর্ব-প্রস্তুতি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পুরাদমেই চলতে থাকে। ঠিক যেমন মাতৃভাষা আয়ত্ত করার আগে অন্য ভাষা

* অনিলমোহন গুপ্ত: বুনিয়াদী-শিক্ষা-পদ্ধতি, ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

শিক্ষা কোন শিশুর ঘাড়ে চাপালে তার মাতৃভাষাও ভাল ক'রে শেখা হয় না, আর অন্য ভাষার জ্ঞানও থেকে যায় আব্ছা; তেমনি প্রাথমিক শিক্ষাটা সুসম্পূর্ণ হবার আগেই বিশেষজ্ঞ হবার শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করলে গোড়াটা অত্যন্ত কাঁচা থেকে যায়। বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনাকারীদের মতে শিশুর বিশেষ প্রতিভাটিকে আবিষ্কার করার সময় আসে না। এর পেছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি হচ্ছে এই যে, মনোবিজ্ঞানের সাক্ষ্য অনুসারে কৈশোরের এই সন্ধিক্ষণ অতিক্রম করার আগে শিশুর চিন্তাধারার স্রোতের গতি নিশ্চিতরূপে বোঝা যায় না; দেহবিজ্ঞানীরা বলেন, ১৩।১৪ বছরের আগে কারিগরের কাজ শেখার মত দৈহিক পূর্ণতা শিশুর জন্মায় না। বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনাকারীদের তরফ থেকে এ সম্পর্কে মূল যুক্তি এই যে, বুনিয়াদী শিক্ষার ভেতর দিয়ে যে আদর্শ বিদ্যার্থীর মনে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়, যে উঁচু গ্রামে চরিত্রকে বাঁধবার চেষ্টা করা হয়, যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব তাঁরা বিদ্যার্থীর মনে গ'ড়ে তুলতে চান, যে নাগরিকবোধ ও কর্তব্যবোধ বিদ্যার্থীর মনে জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়, তাকে স্থায়ীভাবে বিদ্যার্থীর আসনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অন্তত ওই সময়টুকু প্রয়োজন, এবং ন্যূনপক্ষে চৌদ্দ বছর বয়সের আগে বিদ্যার্থী বুদ্ধিযুক্তভাবে এই আদর্শকে আত্মস্থ করতে পারে না। যে শিক্ষার, কেবল বুদ্ধির বিকাশ নয়, চরিত্রগঠনও মূল উদ্দেশ্য, সেখানে এই মূল উদ্দেশ্যটিকেই বাদ দিলে আর কি থাকে! সুতরাং সময় সংক্ষেপ করতে গিয়ে মূললক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হ'লে বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য অল্পই অবশিষ্ট থাকবে।

১২ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাস ক'রে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সুপ্রচুর

কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, চরিত্রবলে বিশ্বের সম্মান অর্জন করেছেন,—এ রকম অনেক দৃষ্টান্ত হয়তো এই যুক্তির বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করা হবে। কিন্তু ১৮ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাস ক'রে বিশ্বের দরবারে স্থান অর্জন ক'রে নেবার দৃষ্টান্তেরও তো অসদ্ভাব দেখি না। জগতের মধ্যে প্রতিভাবান ও জড়বুদ্ধি শিশু থাকবেই,—তারা কিন্তু সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। আমাদের গড় আয়ু ২৭ বছর। তাই বোধ হয় বয়স নিয়ে আমরা এত হৈ-চৈ করছি। দু'বছর আগে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার তাড়ায় তার অপরিণত ঘাড়ে সাধ্যাতিরিক্ত বোঝা চাপাবার চেষ্টা না ক'রে আমরা যদি গড় আয়ুকে ২৭ থেকে ৬০ বছরে তোলবার চেষ্টা করি, তবে বোধ হয় অনেক উপকারও হবে, আর বিশ্বসভায় স্থান ক'রে নেবার প্রস্তুতির সময়ও অনেক বেড়ে যাবে। শিক্ষাকে দু'বছর কমানোর চাইতে আয়ুকে ত্রিশ বছর বাড়ানোর চেষ্টা করলে আমরা নিশ্চয়ই অধিকতর লাভবান হব। বস্তুত গান্ধীজীর কাছে বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যাপ্তি ও শিক্ষাশেষের বয়স প্রধান বিবেচ্য ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষালাভে শিশুকে স্বাবলম্বী হতে হবে, নাগরিক হিসাবে কতগুলি দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত হতে হবে—এই সকল অর্জন করাই হবে বিদ্যার্থীর লক্ষ্য, তাতে যতখানি সময় লাগে ততটা সময় দিতে হবে তাকে। তাই এক জায়গায় গান্ধীজী বলেছেন, "মেরা তো সাত বরসকে সাথ সাদী নেহী হুয়ী, সাদী হুয়ী তো স্বাবলম্বনকে সাথ।"

সর্বশেষে নারায়ণবাবুর একটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমার মন্তব্য জানিয়ে এই বক্তব্য শেষ করব। তিনি লিখেছেন, "শুধু কুটিরশিল্পের প্রসার হইলে এবং পল্লীবাসীর অভাব মিটিলেই দেশের আর্থিক ও

সাংস্কৃতিক উন্নতি সংঘটিত হইবে না। বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগ চলিতেছে।...কুটিরশিল্পকে যন্ত্রশিল্পের পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করিয়া সমাজ-জীবনে পল্লী ও শহরের মধ্যে সহযোগিতার সেতু স্থাপন করিতে হইবে।"

প্রথম বাক্যটিতে নারায়ণবাবু যা বলেছেন, তার সঙ্গে কারও দ্বিমত থাকতে পারে না। আমার বক্তব্য শুধু এই যে, বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনাকারীরা কুটিরশিল্পের পক্ষ থেকে এমন কোন দাবি করেন নি। আসল কথা এই যে, কুটিরশিল্পের প্রসার না হ'লে ও পল্লীবাসীর অভাব না মিটলে দেশের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক কোন উন্নতি সংঘটিত হতে পারে না। কুটিরশিল্পের প্রসার ও পল্লীবাসীর দুর্গতিমোচন শেষ কথা নয়, গোড়ার কথা। সমগ্র দেশকে জাগ্রত ক'রে তুলতে হ'লে ওইটুকু একান্তই প্রয়োজন। যে দেশের শতকরা ৮০ জন লোকের দু'বেলা পেট ভ'রে অন্ন জোটে না, সে দেশের প্রতিভা যদি এই সমস্যাকে উপেক্ষা ক'রে অন্য দিকে দৃষ্টি দেয়, যদি এই সমস্যার সমাধানে অপরাগ হয়ে সাহিত্য, দর্শন কপচায়, তবে সে প্রতিভা শ্মশানের প্রতিভা, সে প্রতিভার গর্ব না করাই ভাল।

অবান্তর হ'লেও হঠাৎ পণ্ডিত জওহরলালের কথা মনে প'ড়ে গেল। তিনি জাতীয় পরিষদে সেদিন মাত্র জানিয়েছেন যে, ভারতের আন্তর্জাতিক মর্যাদা রক্ষার জন্য নাকি আমাদের বড়লাটকে মাসিক লক্ষাধিক টাকা বৃত্তি দেবার প্রয়োজন আছে। যে দেশের অর্ধেক লোক আধপেটা খায়, অর্ধনগ্ন থাকে, যে দেশের শতকরা ৯০ জন লোক অশিক্ষিত, চিকিৎসার সামান্যতম সুবিধা থেকেও বঞ্চিত— সে সব কাহিনী জগতের দেশে দেশে প্রচারিত হ'লেও আমাদের

অমর্যাদা হবে না, সব অমর্যাদা ঢেকে যাবে বড়লাটকে লম্বা মাইনে দিলে! পণ্ডিতজীর মুখে আমরা এমন কথা শুনব আশা করি নি, কিন্তু আমাদের প্রতিভার গতি এমনিই হয়েছে।

দ্বিতীয় বাক্যে শ্রীযুক্ত চন্দ্র বোধ হয় বোঝাতে চেয়েছেন যে, এটা বিজ্ঞানের যুগ চলছে, আর বুনিয়াদী শিক্ষা কুটিরশিল্প, কৃষি ইত্যাদির দিকে ঝোঁক দিয়ে পেছনের দিকে চলেছে। বিজ্ঞানকে এখানে যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে ব'লে আমার আশঙ্কা হয়। বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে—প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তার আচরণের মূল সূত্রগুলি আবিষ্কার করা। যন্ত্রে তার প্রয়োগ মাত্র। এ প্রয়োগের সার্থকতা সেখানেই, যেখানে প্রয়োগ মঙ্গলের বাহক। কিন্তু মঙ্গলামঙ্গল বিচার না ক'রে যন্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবহারেই আমরা বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ ব'লে ধ'রে নিয়েছি। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা শ্রী জে. সি. কুমারাপ্পা তাঁর 'Why the Village Movement' ও 'Economy of Permanence'-এ করেছেন। আমার এখানে বক্তব্য শুধু এই যে, বিজ্ঞানকে বুনিয়াদী শিক্ষা বিন্দুমাত্র অবহেলা করে নি, এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করাকে বুনিয়াদী শিক্ষায় একটি শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় কেবলমাত্র বিজ্ঞানের কতকগুলি সিদ্ধান্ত মুখস্থ না করিয়ে আরও গোড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে বিদ্যার্থীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও বৈজ্ঞানিক অভ্যাস গঠন করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। আমার মনে হয়, প্রাথমিক শিক্ষায় অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গলাধঃকরণ করানর চাইতে এই মনোভাব সৃষ্টির প্রয়োজন অনেক বেশি।

যন্ত্রশিল্প সম্বন্ধে গান্ধীজীর মতামত তাঁরই জবানিতে উদ্ধৃত করছি ঃ “আমি যন্ত্রকে ধ্বংস করতে চাই না, তার কর্মক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করতে চাই। কুটিরবাসী কোটি কোটি মানুষের কর্মভার লাঘব করবে যে যন্ত্র, তাকে আমি স্বাগত জানাই।…যদি গাঁয়ের ঘরে ঘরে আমরা বিদ্যুৎশক্তি পৌঁছে দিতে পারি, সেই বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে গ্রাম-বাসীরা যন্ত্র চালালে আমি ক্ষুণ্ণ হব না। …কিন্তু স্বল্পসংখ্যক লোকের হাতে বিত্ত ও ক্ষমতা সঞ্চয় করার জন্য যদি যন্ত্রের ব্যবহার হয়, আমি তা অন্যায় ও পাপ ব’লে মনে করি। অধুনা যন্ত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়।…ভারতের সাত লাখ গাঁয়ে যে সজীব যন্ত্র ছড়িয়ে আছে, তার বিকল্পে প্রাণহীন যন্ত্র বসাতে চাই না।…আমাদের দেশের যা কিছু প্রয়োজন, তা যদি তিন কোটি লোকের বদলে ত্রিশ হাজার লোকের দ্বারা প্রস্তুত হয়, আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ওই তিন কোটিকে অলস ক’রে বেকার বসিয়ে রাখা চলবে না।”*

সুতরাং গান্ধীজীর বিদ্রোহ যন্ত্র-সভ্যতার বিরুদ্ধে নয়, যন্ত্র-অসভ্যতার বিরুদ্ধে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে শিল্পশিক্ষা দেওয়া হয়, তা বৃত্তি হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হয় না—এ কথা পূর্বেই বলেছি। এই শিক্ষার দ্বারা শিশুর দেহমনের বিকাশ হয়। টাকু চরখা এগুলিও যন্ত্রই। এগুলি ব্যবহারের দ্বারা শিশু ভবিষ্যতে জটিলতর যন্ত্র ব্যবহারেরই পূর্বপ্রস্তুতি লাভ করে। এজন্য ডাঃ জাকির হোসেন বলেছেন যে, যদি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করার পর বিদ্যার্থী বৃহৎ যন্ত্রশিল্পে যোগদান করতে চায়, তবে তাতে কোন অসুবিধাই হবে না।

* ধীরেন্দ্রলাল ধর : ‘আমাদের গান্ধীজী’, পৃ. ৩৮৫

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে নানা যন্ত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার ফলে তার যে নিপুণতা জন্মাবে, তাতে তার পক্ষে এই পথ নেওয়া সহজতর হবে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণের ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে সহযোগের সেতুটি ভেঙে যাবে ব'লে শ্রীযুক্ত চন্দ্র যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, তা একান্তই ভিত্তিহীন। বৃহৎ যন্ত্রশিল্প একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যাবে, বা মানবজাতির কোন কল্যাণেই লাগবে না—এমন কল্পনা গান্ধীজী নিশ্চয়ই করেন নি ; কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়ে এর স্বেচ্ছাচার থেকে মুক্তি পাবার একটা বাস্তব পথ তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। গ্রাম ও শহরের মধ্যে সেতুর প্রয়োজন অনস্বীকার্য, কিন্তু শোষণ-ব্যবস্থাকে কায়েম রাখার জন্য সেতুটির ব্যবহার মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

স্বাধীন ভারতের শিক্ষা-সংস্কার

দুই

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ্র মশাই গত অগ্রহায়ণের 'শনিবারের চিঠিতে' স্বাধীন ভারতে শিক্ষা-সংস্কার সম্পর্কে যে মন্তব্যগুলি করেছেন, তারই উত্তরে দু-একটি বক্তব্য লিখতে বসেছি। চন্দ্র মশাইয়ের ওই প্রবন্ধটি কার্তিকের সংখ্যায় প্রকাশিত আমার কয়েকটি মন্তব্যের সমালোচনা। এই সমালোচনা সম্পর্কে আমি নীরবই থাকতে চেয়েছিলাম ; কিন্তু বন্ধুরা অনেকে আমার বক্তব্যের কৈফিয়ৎ তলব করেছেন। অনবরত ঘোরাঘুরি ও কাজের চাপে উত্তর লিখতে বসতে এত দেরি হ'ল ব'লে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

প্রথমত, "বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রামবাসীর শিক্ষা বলিয়া গ্রহণ করিতে অনিলবাবুর আপত্তি আছে" ব'লে চন্দ্র মশাই যে মন্তব্য করেছেন, তা পুরোপুরি ঠিক নয়। বুনিয়াদী শিক্ষা নিশ্চয়ই গ্রামবাসীর শিক্ষা ; তবে ভৌগোলিক অর্থে কেবলমাত্র গ্রামবাসীর শিক্ষা নয়—এইটেই আমার বক্তব্য। বুনিয়াদী শিক্ষা একটা গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতার শিক্ষা-ব্যবস্থা। 'নীরব সামাজিক বিপ্লবের' ফলস্বরূপ এই গ্রামকে আজকার জীর্ণ মুমূর্ষু গ্রামে সঙ্গে একীভূত করতে গেলে আমরা ঠকব।

বুনিয়াদী শিক্ষা যে শুধুমাত্র গ্রামবাসীরই শিক্ষা—এ কথা সপ্রমাণ করার জন্য চন্দ্র মশাই 'বুনিয়াদী জাতীয় শিক্ষা (Basic National Education)' পুস্তকের মুখবন্ধ থেকে খোদ গান্ধীজীর লেখা উদ্ধৃত করেছেন। বন্ধুদের প্রশ্নও প্রধানত এই বিষয়টিকেই কেন্দ্র

ক'রে! অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি তো বলছেন, পশ্চিমবঙ্গে সত্যি-কারের গ্রামই নাই, সুতরাং এই প্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষা চলতেই পারে না।

বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মী হিসাবে 'বুনিয়াদী জাতীয় শিক্ষা' বইখানি পড়া স্বাভাবিক। তবু কেন বুনিয়াদী শিক্ষা কেবলমাত্র গ্রামবাসীদের জন্য পরিকল্পিত নয় এ কথা বলার ধৃষ্টতা হ'ল, তার কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। শহরের পণ্ডিত ব্যক্তিরা গান্ধীজীর এই লেখাটুকুকে উদ্ধৃত ক'রে বুনিয়াদী শিক্ষাকে অন্তত শহর থেকে দূরে রাখতে চান, তা জানি। তাঁদের দয়া ক'রে উদ্ধৃত অংশটুকুকেই ভাল ক'রে তলিয়ে পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। গান্ধীজী স্পষ্টভাবেই উদ্ধৃত অংশটুকুতে 'Rural' (গ্রাম্য) ও 'National' (জাতীয়) এই দুইটি কথার সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। গ্রামের ব্যাপ্তিকে তিনি শহর দিয়ে সীমাবদ্ধ করেন নি—'Rural excludes the so-called higher or English education' (গ্রাম্য শব্দটা তথাকথিত উচ্চ অথবা ইংরেজী শিক্ষাকে বাদ দিচ্ছে)। 'National at present connotes truth and non-violence' (সত্য ও অহিংসাই হচ্ছে বর্তমানে 'জাতীয়' কথাটির সংজ্ঞা)। সুতরাং 'গ্রাম্য' বা 'জাতীয়' এই শব্দ দুটিকে গান্ধীজী এখানে ভৌগোলিক অর্থে ব্যবহার করেন নি। 'Rural' মানে এখানে শহর ব্যতিরিক্ত গ্রাম নয়, এবং 'National' বলতেও তিনি এখানে কেবল ভারতবর্ষকে বোঝেন নি; সংজ্ঞা এখানে মোটেই ভৌগোলিক নয়—আদর্শগত।

তা ছাড়া গান্ধীজীর মতে বুনিয়াদী শিক্ষা যে সমগ্র দেশের

সকল শিশুরই জন্য, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পরিকল্পনার জনকের লেখা ঘাঁটলে অনেক জায়গাতেই চোখে পড়বে। তাঁর ইচ্ছার দ্ব্যর্থহীন একটিমাত্র অংশ এখানে উল্লেখ করছি :

"বুনিয়াদী শিক্ষা ভারতের যাহা কিছু চিরন্তন এবং যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহার সহিত শিশুদের, কি শহরের, কি গ্রামের, সংযোগ রাখিবার চেষ্টা করে। ইহা দেশের মাটির সঙ্গে শিশুকে সংযুক্ত করিয়া রাখে এবং তাহার সম্মুখে ভবিষ্যতের এক গৌরবময় আদর্শ স্থাপন করে। শিশু তাহার শিক্ষার আরম্ভ হইতেই এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে থাকে।" (গঠনকর্মপন্থা—ইহার অর্থ ও স্থান, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৪১)

আশা করি, বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনার জনকের ইচ্ছা এখানে সুস্পষ্ট।

আর পরিকল্পনার জনকের ইচ্ছা যাই হোক না কেন যদি একটা বিশেষ পদ্ধতি শিশুকে শিক্ষা দেবার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত হয়, তবে তার আশীর্বাদ থেকে কোন শিশুকে বঞ্চিত করা হবে কেন ?

এর একটা কারণ এই হতে পারে যে, শহরে এই শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা এই মতকে সমর্থন করে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখে শিক্ষা দেওয়াই বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য ; সুতরাং স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য খানিকটা স্বাধীনতা বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবেই রয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষা একে সজীবতার লক্ষণ বলেই স্বীকার ক'রে নিয়েছে। বুনিয়াদী

শিক্ষায় যে কাজকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষা দেবার পরিকল্পনা করা হয়েছে, তা জীবনের পক্ষে অপরিহার্য। যেখানেই মানুষ আছে সেখানেই এই সকল কাজের ব্যবস্থা কোন না কোন রকমে আছে। জীবনের সঙ্গে এই কাজগুলির সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ বলেই এগুলিকে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এত উপযুক্ত ব'লে গ্রহণ করা হয়েছে। অনেক সময় বলা হয়, শহরের বিদ্যালয়ে জমি পাওয়া শক্ত, তাই বাগানের কাজ করানো সম্ভব নয়। এ কথা স্বীকার ক'রে নিলেও শহরের বিদ্যালয়ে বুনিয়াদী শিক্ষা চালু করার পক্ষে অসুবিধা ঘটবার বিশেষ কারণ নাই। আমাদের পরিধেয় আজও শহরের মিলেই তৈরি হয়। বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শে আমরা যদি বিশ্বাস করি, শিল্পের কেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হয় এবং তারই মধ্য দিয়ে মানুষের পরাধীনতা ও লাঞ্ছনার পথ তৈরি হয়—এ যদি আমরা বুঝে থাকি, তবে শহরের বিদ্যালয়ে কাপড় তৈরি করার কাজকে বিকেন্দ্রিত ক'রে দিতে আমরা দ্বিধা করব না। কাপড় তৈরি করা, যন্ত্রপাতি তৈরি করা ইত্যাদি কাজকে মূল শিল্পরূপে গ্রহণ ক'রে শহরের বিদ্যালয়গুলিতে বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি চালু করা সম্ভব ব'লেই মনে হয়। বস্তুত 'জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া' কর্তৃক পরিচালিত ওক্‌লার বুনিয়াদী বিদ্যালয় ভারতের রাজধানীতেই অবস্থিত।

এ ছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষাকে শহর অঞ্চল থেকে ছেঁটে ফেলার ইচ্ছার যে কারণ হয়তো আমাদের অচেতন মনে রয়েছে ব'লে আশঙ্কা করি, সেটাই সব চাইতে মারাত্মক। বুনিয়াদী শিক্ষার গায়ে 'গাঁয়ের শিক্ষা' ব'লে ছাপ এঁটে দেবার মূলে একটা ভেদবুদ্ধি ক্রিয়া

করছে ব'লে আমার আশঙ্কা হয়। বিদেশী শাসন আমাদের দেশের ছেলে চুরি ক'রে, দেশের প্রতিভাকে স্থানচ্যুত ক'রে শহর গড়েছে। ফলে আমাদের গ্রামগুলিকে রিক্ত ক'রে বুদ্ধিমানেরা ভিড় করেছেন শহরে, গাঁয়ের উদার আকাশ-বাতাস-জমি-পুকুরকে অবজ্ঞা ক'রে শহরের খাঁচার মধ্যে সেঁধনোকেই মোক্ষ ব'লে ধারণা করেছেন। ফলে দেশের চিত্ত-জলাশয় হয়েছে শুষ্ক, একটু একটু জল যেখানে এ-জায়গায় ও-জায়গায় জমেছে সেখানে এসেছে বিকৃতি। এই ক'রে এক জায়গায় পুঞ্জীভূত হয়েছে অর্থ, অন্য জায়গায় রিক্ততা ; এক জায়গায় বিলাস, অন্য জায়গায় জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ; এক জায়গায় শাসন, অন্যত্র শোষণ। আমরা যদি স্বাধীন ভারতেও এই ভেদকে কায়েম ক'রে রাখতে চাই, তবে আমাদের আত্মবিলুপ্তি ঘটবে—এই আমার ধারণা। গ্রাম আর শহরের মধ্যে সহজ সেতু হবে বুনিয়াদী শিক্ষা, এই সার্বজনীন শিক্ষার মধ্য দিয়েই জাতীয় ঐতিহ্য শিশুরা গ্রহণ করবে, এই শিক্ষার মধ্য দিয়েই তারা নিজেদের যোগ্য কর্মক্ষেত্র বেছে নেবার সুযোগ পাবে। শহরে জন্মেছে ব'লে শিশুকে চিরকাল শহরে থাকতে হবে—এ হবে বংশগত কৌলিন্যেরই আর একটা দিক। এর ফলে গ্রাম আর শহরের মধ্যে যে ভেদের প্রাচীর, স্বার্থ-সংঘাতের ফাটল গ'ড়ে উঠেছে, তা আরও সুদূরপ্রসারী হবে।

দ্বিতীয়ত, 'সুসম্বদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী' সম্পর্কে আমার মন্তব্যের যে অর্থ চন্দ্র মশাই করেছেন, তার সঙ্গে আমার বক্তব্যের কোন যোগ নাই। সম্পূর্ণ নূতনকে পরিপূর্ণভাবে দেখতে না পাওয়ার অর্থ পুরাতন মোহ ও সংস্কারের জালে আবদ্ধ হয়ে থাকা নয়। বৈজ্ঞানিক কল্পনা

বৈজ্ঞানিক তথ্যের জনক হ'লেও এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ অনেকখানি। শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক কল্পনা শিক্ষার আদর্শই দিতে পারে, খুঁটিনাটি আবিষ্কার করা পরীক্ষাসাপেক্ষ। বুনিয়াদী শিক্ষার পূর্ণতর রূপ হচ্ছে 'নঈ তালিম'। জন্মক্ষণ থেকে মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত মানুষের শিক্ষার ধারা কোন্ পথে বওয়া উচিত, তার সুস্পষ্ট আদর্শ গান্ধীজী নির্দেশ করেছেন; কিন্তু বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার খুঁটিনাটি স্থির করার অপচেষ্টা করেন নি। সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থা একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ ব'লে একের প্রয়োজনে অন্য শিক্ষা, প্রাথমিক স্তরের শেষে উচ্চ-শিক্ষার রূপ আপনি গ'ড়ে উঠবে। আজকার প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার তফাৎ এত যে, আজকার উচ্চশিক্ষার ধারণা নিয়ে ভবিষ্যৎ উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষার কথা ভাবতে গেলে ভাবের ঘরে চুরি করার সম্ভাবনা থাকবে সুপ্রচুর। আজকার উচ্চশিক্ষার কাঠামো বজায় রেখে যদি বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের কথা আমরা ভাবি, তবে ঘর বজায় রেখে ভিত পালটানোর মত মূর্খতা হবে ব'লে আমার বিশ্বাস।

তৃতীয়ত, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশু যে কাজ করে, তা কেবলমাত্র নিপুণ কারিগর হবার জন্য নয়—বিকেন্দ্রিত, স্বাশ্রয়ী, শোষণহীন সমাজব্যবস্থার উপযুক্ত নাগরিক হবার জন্য। এই নাগরিকত্বের যোগ্যতা অর্জন করার জন্য দীর্ঘকাল এবং একটা বিশেষ বয়স পর্যন্ত শিক্ষার মধ্য দিয়ে যাওয়া উচিত। ৭ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা এবং ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা এরই নির্দেশক। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, পূর্তবিদ্যা ইত্যাদিতে বিশেষজ্ঞ হবার জন্য বিশেষ প্রস্তুতি আজও ১৪ বৎসরের আগে শুরু হয় না, আর

শুরু হওয়া উচিত কি না সে বিষয়েও বিশেষজ্ঞদের সন্দেহ আছে। তা ছাড়া প্রত্যেক শিশুর ব্যক্তিগত প্রতিভার বিকাশের দিকে লক্ষ্য দেওয়া এবং তার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করাই বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। সে ক্ষেত্রে বুনিয়াদী বিদ্যালয় থেকে ছাড়িয়ে এনে অন্য বিদ্যালয়ে শিশুকে দিলে কেন ও কি ভাবে শিশুর মঙ্গল হবে? প্রত্যক্ষ সমস্যার মাধ্যমে সর্বেন্দ্রিয় ও সমগ্র সত্তা দিয়ে শিশু যে জ্ঞান লাভ করে, বই পড়িয়ে কি বিশেষজ্ঞ হবার পথ এর চাইতে সুগম হবে? আর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের যা মূল উদ্দেশ্য ও আদর্শ, তাই যদি সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থারও আদর্শ হয়, তবে আলাদা ধরনের বিদ্যালয়ের অর্থ কি?

সর্বশেষে গৃহশিল্প ও বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের কথা এসেছে। এই দুটি পরস্পরের পরিপূরক হবে, সে বিষয়ে আমি চন্দ্র মশাইয়ের সঙ্গে একমত। কিন্তু আমাদের মধ্যে বোধ হয় মতভেদ এ দুটির সীমারেখা নিয়ে। চন্দ্র মশাইয়ের যুক্তি হচ্ছে এই যে, "কেবলমাত্র কুটিরশিল্পের সহায়তায় আমরা বর্তমান বিজ্ঞানের যুগের সঙ্গে সমান তাল রাখিয়া চলিতে পারিব না।" আমার মতে সমান তাল রেখে চলাটাই প্রধান বিচার্য নয়। এ যুগটা কেবল বিজ্ঞানের যুগ নয়, এ যুগ মিথ্যাচারের যুগ, কেন্দ্রীকরণের যুগ, প্রতিযোগিতা ও হানাহানির যুগ, সুতরাং যুগধর্মের দোহাই দিয়ে ভাটার টানে গা এলিয়ে দিতে হ'লে মনুষ্যত্বকে সেই সঙ্গে বিসর্জন দিতে হয়। সামর্থ্যের দোহাই দিয়ে জগতে অনেক অন্যায় আমরা করি— কালোবাজারকে ঘৃণা করি, আবার প্রতিপদে কালোবাজারেরই সহায়তা করি; মিথ্যা কথা বলা উচিত নয় আওড়াই, আবার না

বললে চলে না—এমনিতর যুক্তির দোহাই দিয়ে মিথ্যা কথার তুবড়ি ছাড়ি। পাল্লা দিয়ে চলা, সামর্থ্য ইত্যাদি এখানে আমাদের বিচার্য নয়, আমাদের বিচার্য মানুষের মঙ্গলামঙ্গল। মানুষের মঙ্গলের জন্য যতটুকু বৃহৎ যন্ত্রশিল্প প্রয়োজন, ততটুকুই আমরা গ্রহণ করিতে পারি, তার বেশি নয়। মানুষের মঙ্গলকে ছাপিয়ে যন্ত্রের চিন্তাই আমাদের মধ্যে প্রধান হয়ে উঠেছে—এই আমার অভিযোগ। সকলের মঙ্গলের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে তাকে অবজ্ঞা ক'রে যদি আপাত-উজ্জ্বল কোন পথরেখাকে অনুসরণ করি, তবে তার ফল বিষময় হতে বাধ্য। আমার ধারণা, বর্তমান বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের যুগ এই সত্যকে উপেক্ষা ক'রে চলেছে, সুতরাং উজান ঠেলে চলার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।

বিজ্ঞ ব্যক্তিরা একে ভাববিলাস ব'লে বিদ্রূপ করতে পারেন। কবিগুরুর ভাষায় শুধু বলব : "Whatever is true is real. Reality is related to truth, as the canvas to the picture—it must be there at the back. And if my ideal of the centre of Indian culture has any truth, it can be, and therefore must be, realised at all cost"। বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যে, বৃহৎ যন্ত্রসভ্যতার আমূল পরিবর্তনের মধ্যে যদি সত্য নিহিত থাকে, তবে আজকার সভ্যতার চেহারা দেখে তা যতই অসম্ভব মনে হোক না কেন, সে সত্যই জয়ী হবে। আমাদের কর্তব্য, সত্যের ওই দীপশিখাকে অনির্বাণ রেখে নির্ভয়ে এগিয়ে চলা।

পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষা

১৯৩৭ অব্দে 'হরিজন' পত্রিকায় কতকগুলি প্রবন্ধের মারফতে গান্ধীজ। দেশের সামনে বুনিয়াদী-শিক্ষা-পরিকল্পনাকে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করেন। এই প্রবন্ধগুলিতে আলোচিত যুক্তি ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষাকে গড়ে তোলা সম্পর্কে আলোচনার জন্য ১৯৩৭ খৃঃ অব্দের ২২শে ও ২৩শে অক্টোবর ওয়ার্ধায় মাড়োয়ারী এডুকেশন সোসাইটির উদ্যোগে ভারতবর্ষের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌দের এক সম্মেলন হয়। শিক্ষাবিদ্‌দের সামনে গান্ধীজী সুস্পষ্টভাবে তাঁর প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করলেন। এই সম্মেলনের ফলে 'জাকির হোসেন' কমিটি গঠিত হ'ল এবং সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী এই কমিটি ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজীর হাতে তাঁদের বিবরণী পেশ করেন। এই বিবরণীতে সমগ্র দেশের প্রত্যেকটি ৭ থেকে ১৪ বৎসর বয়স্ক শিশুর ৭ বৎসর ব্যাপী অবৈতনিক আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা কোন্ আদর্শে এবং কার্যসূচী অনুসারে হওয়া উচিত তা বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়। ১৯৩৮ খৃঃ অব্দের হরিপুরা অধিবেশনে ভারতীয় কংগ্রেস বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষারূপে গ্রহণ করেন এবং জাকির হোসেন কমিটির প্রস্তাবকে রূপায়িত করার জন্য 'হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ' নাম দিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সে সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস সরকার গঠন করেছে। বিভিন্ন প্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োগ সুরু হল। কিন্তু যুদ্ধের

ব্যাপারে ১৯৩৯ খৃঃ অব্দে কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী পদত্যাগ করেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিহার এবং বোম্বাই ছাড়া অন্যান্য সব প্রদেশে সরকারী প্রচেষ্টায় বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। বাঙলা দেশে অবশ্য সেটা লীগ মন্ত্রীমণ্ডলীর আমল, সুতরাং সে সময় বাঙলা দেশে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োগ কিছুমাত্র হয়নি।

১৯৪২ সাল। সমগ্র ভারতব্যাপী 'ভারত ছাড়' আন্দোলন, উত্তাল হয়ে উঠল। সরকারী শনির দৃষ্টি বেসরকারী বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির উপর পড়ল। বিদ্যালয়গুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হ'ল, শিক্ষকরা স্থান পেলেন কারান্তরালে। বিহারে ও বোম্বাইতে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রদীপ টিম টিম করে জ্বলতে লাগল—তাতে শিখার চাইতে ধোঁয়ার প্রকোপটাই রইল বেশী।

১৯৪৪ খৃঃ অব্দে গান্ধীজী ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য মুক্তি পেলেন। বেরিয়ে এসেই তিনি বললেন যে, কারান্তরালে তিনি বুনিয়াদী শিক্ষার তাৎপর্য সম্পর্কে গভীরভাবে ভেবেছেন এবং তাঁর মন উদ্বেল হয়ে আছে। ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েই তিনি বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন। শিশুদের জন্য সাত-বছর-ব্যাপী বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনার বদলে তিনি সমগ্র জাতির জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার পরিকল্পনা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। ১৯৪৪ অব্দের নভেম্বর মাসেই হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের অধিবেশন বসল। গান্ধীজীর পরিকল্পনাকে তাঁরা গ্রহণ করলেন। বুনিয়াদী শিক্ষার রূপান্তর ঘটল। এবারে বিস্তারিত পরিকল্পনা-রচনার কাজ সুরু হ'ল উৎপাদনমূলক কাজের মাধ্যমে সমগ্র জীবনব্যাপী শিক্ষার—যে শিক্ষা জীবনের প্রত্যেক পর্যায়ে অহিংস

সমাজের স্বাবলম্বী নাগরিককে গড়ে তুলবে। এবারে শিক্ষাব্যবস্থার নাম দেওয়া হল নঈ-তালীম বা নূতন শিক্ষা। এই সমগ্র শিক্ষাকে চারিটি পর্যায়ে ভাগ করা হল ঃ

১। পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষা—২½ থেকে ৭ বৎসরের শিশুদের শিক্ষা ;

২। বুনিয়াদী শিক্ষা—৭ থেকে ১৪ বৎসর বয়সের কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষা ;

৩। উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষা—বুনিয়াদী-শিক্ষা-সমাপ্তির পরের স্তরের শিক্ষা ;

৪। বয়স্ক-শিক্ষা—১২ বৎসর বয়সের নিরক্ষর ছেলেমেয়েদের থেকে সুরু ক'রে বড়দের সারাজীবনব্যাপী শিক্ষা।

উপরোক্ত সভায় পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রচনার জন্য একটি উপসমিতি গড়ে দেওয়া হ'ল। তার আহ্বায়িকা হলেন শ্রীআশা দেবী আর্যনায়কম্। ভারতে পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষার প্রস্তুতি সুরু হ'ল।

মানুষের জীবনে শৈশব যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সময়, এ সময়কার শিক্ষার গভীর প্রভাব যে সমগ্র জীবনের ওপর পড়ে, এ সম্পর্কে সচেতনতা নূতন নয়। মানুষের মত দেহ নিয়ে জন্মালেই মানুষ হওয়া যায় না, মনুষ্যত্ব-অর্জন সাধনাসাপেক্ষ, তাই তার প্রস্তুতিও দীর্ঘ। মানব-শিশু দীর্ঘস্থায়ী শৈশবের মধ্য দিয়ে সেই সাধনাই করে।

শিশু যেদিন জন্মায় সেদিন সমগ্র বিশ্ব তার কাছে একান্ত অপরিচিত। প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে উন্মুখ ক'রে শিশু বিশ্বজগতের

সম্মুখীন হয় প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসা নিয়ে। প্রকৃতির কোলে শুরু হয় শিশুর শিক্ষা। একান্ত অসহায় পরনির্ভরশীল শিশু তার জীবনের প্রথম সাত বছরের মধ্যে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে, তার চার পাশের জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যায় এবং পরিচয় লাভের সূত্রটির রহস্যও আবিষ্কার ক'রে ফেলে। নিজের আত্মপ্রকাশ ও পরকে বুঝবার ক্ষমতা সে লাভ করে, তার কল্পনা যুক্তি ইচ্ছা অনুভূতি বিকাশ লাভ করে, ব্যক্তি ও সমাজের ওপর তার আচরণ গড়ে ওঠে। এ শিক্ষা যে কত ব্যাপক, কত বিপুল, কত বিস্ময়কর তা সব সময় আমাদের চোখে ঠেকে না। জীবনের এই পর্যায় সম্পর্কে যাঁদের বিশেষ জ্ঞান আছে, তাঁরা অনেকে বলেন যে, জীবনের এই প্রথম ৭ বৎসরে শিশু যত শেখে তার সমগ্র জীবনেও সে ততখানি শেখে না। যাই হ'ক মানুষের জীবনে এই শৈশবকালটি যে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

শিশু তার জীবনের এই সময়টা মা-বাবার স্নেহ ও সান্নিধ্যে কাটাবে এটাই স্বাভাবিক। তাঁদের আনুকূল্যে শিশুর এই সময়কার শিক্ষা পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবে সেটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই একান্ত স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয় ব্যাপারটা প্রায়ই ঘটে না। প্রায়শঃ আমাদের অজ্ঞতার ফলে আমরা আমাদের আত্মজনের বিকাশের পথ নিজের হাতেই রুদ্ধ করে দিই। অন্ধ স্বার্থপরতায় জগতকে, পারিবারিক জীবনকে বড়দের রুচি অনুযায়ী সাজিয়েছি। আমরা বড়রাই সংসারের মালিক এবং বিচারক। পরিবারে শিশুরা যেন ভিক্ষুকের মত। মালিকের অর্থাৎ বড়দের যদি মর্জি-মেজাজ ভাল

থাকে তবে প্রচুর বখশিস—যার প্রতি হয়তো শিশুর কিছুমাত্র আকর্ষণ নেই—শিশুর জুটে যেতে পারে, আবার মালিকের মর্জি বিগড়ালে অসহায় শিশুর বিনা কারণে চড়চাপড় খাওয়া কিছুমাত্র বিস্ময়কর নয়। তাই বড়দের গড়া সংসারে শিশুরা প্রায়শঃ থাকে কুঁকড়ে মুষড়ে, বিকাশের সুযোগ থাকে তাদের বড় কম।

দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার রাজ্য এই দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষে এই সমস্যা আরো ব্যাপক আরো গভীর। মা-বাবার সন্তানকে জানাবার বুঝাবার মত শিক্ষা নেই, সহজাত প্রবৃত্তির বশে সন্তানের প্রতি যেটুকু কর্তব্যবোধ আছে তাও কাজে লাগাবার সুযোগ নেই। মাতাপিতা এখানে জীবিকার জন্য উর্ধ্বশ্বাসে ছুটোছুটি করছেন। ভূমিহীন কৃষি-মজুরদের মধ্যে দেখি, ৭ দিনের শিশুকে হাঁড়িয়া কিংবা পচুই মদ খানিকটা খাইয়ে মা-বাবা কাজে বেরিয়েছেন ; শিল্পাঞ্চলে দেখি, শিশুকে আফিং কিংবা কোন নেশা দিয়ে অভিভূত ক'রে মাতাপিতা চলেছেন কাজ করতে। শৈশবকে যোগ্য মর্যাদা দিতে হবে, শিশুকে পরিপূর্ণভাবে বিকাশ করার উপরই সমগ্র জাতির ভাগ্য নির্ভর করছে একথা জাতি হিসাবে আমরা ইতিপূর্বে ভাবিনি। বহু প্রগ্রতিশীল দেশে উনবিংশ শতাব্দী থেকে একথা কম বেশী ভাবা হচ্ছে, পেস্টালজি, ফ্রয়েবল প্রমুখ শিশু-দরদীরা এদিকে মানুষের মনযোগ আকর্ষণ করছেন। মাদাম মন্তেসরি তাঁর জীবনব্যাপী সাধনায় শিশুশিক্ষায় এক নবযুগের সূচনা করেছেন। শিশুকে যোগ্য শিক্ষা দিলে যে একটা উন্নততর মানবসভ্যতা গড়ে ওঠা সম্ভব তা তিনি প্রমাণিত করলেন প্রত্যহ কাজের মধ্য দিয়ে। তাঁর শিক্ষায় জড়-বুদ্ধি শিশুরা

সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত স্বাভাবিক-বুদ্ধি শিশুদের সঙ্গে বুদ্ধি ও কাজের পরীক্ষায় সমানে পাল্লা দিয়ে চলল। এতে তিনি নিজে বিস্মিত হলেন, শিশুজগৎ একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে জাগ্রত হয়ে উঠল। সুরু হ'ল শিশুর মনের রহস্য আবিষ্কার করার কাজ। শিশু যে কেবলমাত্র ছোট একটি মানুষ নয়—শৈশবের যে বিকাশের নিজস্ব নিয়ম-কানুন আছে দিনের পর দিন তা আবিষ্কৃত হতে লাগল। জড়-বুদ্ধি শিশুদের নিয়ে পরীক্ষা ক'রে মাদাম মন্তেসরি যে সফলতা লাভ করেছিলেন এবার শিশুশিক্ষার ব্যাপকতর ক্ষেত্রে তা প্রযুক্ত হ'ল।

হিন্দুস্থানী তালীমী সঙ্ঘ পূর্ব-বুনিয়ানী শিক্ষার জন্য যে উপসমিতি গঠন করলেন, তার অনেকেই ছিলেন মাদাম মন্তেসরির শিষ্যা। ভারতবর্ষে শিশু-শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহ সবেমাত্র জাগ্রত হতে সুরু করেছে, তবে এ সম্পর্কে সবটুকু প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল সহরের গণ্ডীর মধ্যে। ১৯৪৪ সালের ৫ই ডিসেম্বর উপসমিতির প্রথম অধিবেশন হ'ল। তাঁদের কাজ ছিল সমগ্র ভারতে গ্রাম ও সহরের ৭ বৎসরের কম বয়সের সকল শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা কি ভাবে হতে পারে সে সম্পর্কে পরিকল্পনা রচনা করা। উপসমিতি প্রথমেই গান্ধীজীর শিক্ষা-সংক্রান্ত মূলনীতি মেনে নিলেন। এই মূলনীতিটি হচ্ছে এই যে, শিক্ষার লক্ষ্য হবে স্বাবলম্বী, অহিংস, বিকেন্দ্রিত সমাজের যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলা এবং শিক্ষার মাধ্যম হবে উৎপাদনাত্মক শ্রম। সমিতি এও স্বীকার করলেন যে, এ সম্পর্কে ভারতবর্ষে পরীক্ষামূলক কাজ প্রায় হয়নি বললেই চলে; বিশেষ ক'রে গ্রামের শিশুদের বৈজ্ঞানিকভাবে পর্যবেক্ষণ করার আশু প্রয়োজন রয়েছে। প্রাথমিক

পরীক্ষার কাজ চালাবার জন্য একটা সাময়িক কার্যক্রম ঠিক ক'রে দেওয়া হ'ল। ঠিক হ'ল, নিম্নলিখিত কাজগুলিকে কেন্দ্র ক'রে শিশু-পর্যবেক্ষণের কাজ সুরু হবে:

(১) শিশুর উপযুক্ত খাদ্য, (২) স্বাস্থ্য-পরীক্ষা এবং চিকিৎসা, (৩) ব্যক্তিগত এবং সামুদায়িক পরিচ্ছন্নতা, (৪) প্রাথমিক সামাজিকতার শিক্ষা, (৫) উৎপাদনাত্মক কাজ, (৬) ভাষা, চিত্র, সঙ্গীত ও নৃত্যাদির মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ, (৭) খেলা, (৮) প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচয়।

১৯৪৫ সনের জানুয়ারী মাসে সেবাগ্রামে জাতীয়-শিক্ষা-সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনের প্রস্তাব অনুসারে এই বৎসরের ২৬শে মার্চ হিন্দুস্থানী তালীমী সঙ্ঘ শ্রীআশা দেবী আর্যনায়কম্‌কে আহ্বায়ক ক'রে ১১ জন সদস্য নিয়ে পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষা-সমিতি গঠন করেন। ১৯৪৫ সনের জুলাই মাসে সেবাগ্রামে এবং অক্টোবর মাসে বোম্বাইতে এই সমিতির একটি অধিবেশন হয়। এই আলোচনার ফলে পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে সমিতি একটি বিস্তারিত কার্যসূচী রচনা করেন। সমিতির সভায় আচার্য বিনোবা ভাবে, শ্রীকিশোরলাল মশরু-ওয়ালা, শ্রীনরহরি পারিখ, কাকাসাহেব কালেলকর এবং ই. ডব্লিউ. আর্যনায়কম্ প্রভৃতি হিন্দুস্থানী তালীমী সঙ্ঘের কর্মীরাও যোগ দেন।

সমিতি স্থির করেন যে, পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষার হিন্দী নাম হবে 'বাচ্চোঁ কী তালীম' এবং পূর্ব-বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে বলা হবে 'বাচ্চোঁ কা ঘর'।

হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ তাঁদের কার্যক্ষেত্র প্রধানতঃ গ্রামাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ রাখবেন ব'লে স্থির হ'ল।

পূর্ব-বুনিয়াদী এবং বয়স্ক-শিক্ষার মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা সমিতি প্রথমেই আলোচনা করেন। তাঁদের মতে এই দুই পর্যায়ের শিক্ষাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখলে সার্থকতা লাভ কিছুতেই সম্ভব নয়। পূর্ব-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের প্রতি বয়স্কদের আকৃষ্ট করতে হবে, তাঁদের টেনে আনতে হবে বিদ্যালয়ে, তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা আদায় ক'রে নিতে হবে।

সমিতির মতে যেখানে পূর্ণাঙ্গ নয়ী তালীমের প্রয়োগ চলেছে, সেখানেই পূর্ব-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হওয়া উচিত। তবে যোগ্য কর্মী থাকলে এবং অনুকূল পরিবেশ পাওয়া গেলে শুধু পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষার কাজও সুরু করা যেতে পারে।

পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষার কেন্দ্র থাকবে শিশুদের বাড়ী থেকে খুব কাছাকাছি, যেন তারা যখন খুসি গৃহের সান্নিধ্য পেতে পারে। তাতে বাগান করার এবং ছুটাছুটি ক'রে খেলাধূলা করার মত প্রচুর খোলা জায়গা থাকা চাই। সেখানকার পরিবেশ হওয়া চাই আলো-বাতাস-ভরা স্বাস্থ্যকর। কেন্দ্রে প্রচুর পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকা চাই, স্বাস্থ্য-পরীক্ষা ও সাধারণ চিকিৎসার উপকরণ থাকা চাই। বিদ্যালয়ে শিশুদের একটু খাবার ব্যবস্থা করতেই হবে এবং তার মধ্য দিয়ে বাড়ীর খাওয়ার খাদ্যমূল্যের দিক থেকে যেটুকু কমতি পড়ে, সেটুকু পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে।

পূর্ব-বুনিয়াদী কেন্দ্রের জন্য ঘরবাড়ীর প্রয়োজন খুব বেশী নয়। শিশুরা অধিকাংশ সময় কাটাবে খোলা আকাশের নীচে, প্রকৃতির কোলে। বৃষ্টির সময়, কাজকর্ম করার জন্য আশ্রয়স্বরূপ একটা ঘরের ব্যবস্থা থাকলেই চলবে। তবে জিনিষপত্র রাখার জন্য, রান্না-

ঘর হিসাবে এবং ডাক্তারখানা হিসাবে কয়েকটি ঘরের প্রয়োজন হবে।

এক একজন কর্মী ২০ থেকে ২৫ জন শিশুর ভার নিতে পারেন।

পূর্ব-বুনিয়াদী পর্যায়ের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে শিশুর দেহকে সুস্থ ও সবল ক'রে গড়ে তোলার কাজ। শিশু যাতে তার দেহকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারে সেটা সর্বপ্রথমে দেখতে হবে। কেন্দ্রে যতটুকু সময় শিশুরা থাকবে ততটুকু সময়ের মধ্যে এই কাজের অল্পই করা সম্ভব। এজন্য শিশুর গৃহের সঙ্গে গভীর যোগ স্থাপন করতে হবে, শিশুর খাওয়া, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি ব্যাপারে বাড়ীর লোককেও সচেতন ক'রে তুলতে হবে এবং ঘরের ব্যবস্থায় যতটা সম্ভব সংস্কার কর্মীর প্রত্যক্ষ পরিদর্শন ও সহায়তার মধ্য দিয়ে করতে হবে।

সাধারণ রোগ, তাদের প্রতিষেধ ও প্রতিবিধান সম্পর্কে কর্মীর স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। রোগে চিকিৎসকের সহায়তা পাবার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়, যাতে চিকিৎসকের উপদেশ প্রতিপালিত হয় সেটাও পূর্ব-বুনিয়াদী কেন্দ্রের শিক্ষককে দেখতে হবে। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে শিশুদের শিক্ষার একটি মাধ্যম।

পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষায় আত্মকর্তৃত্বের চর্চাকে একটি প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে। শিশুরা প্রথমাবধি নিজেদের ব্যক্তিগত এবং সামুদায়িক কাজ নিজেরা করার শিক্ষা পাবে। স্নান করা, দাঁত মাজা, বাসন-পত্র মাজা প্রভৃতি কাজ সাধারণতঃ তাদের করতে দেওয়া হয় না, পদে পদে ছোট ছোট নিষেধ দিয়ে আমরা ওদের

বেঁধে রাখতে অভ্যস্ত। এতে তাদের মঙ্গলের পরিবর্তে যে অমঙ্গল হয় সে দিকে পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষাসমিতি সুস্পষ্টভাবে অঙ্গুলী নির্দেশ করেছেন।

পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুদের কাজ ও খেলাকে কৃত্রিম গণ্ডী টেনে বিচ্ছিন্ন করা হয়নি। যে কোন শিক্ষামূলক কাজ শিশুর কাছে খেলা থেকে ভিন্ন নয়। বড়দের ভাষায় যেগুলিকে কাজ বলা যায় তেমন কাজ কিছু কিছু শিশু প্রথমাবধিই আনন্দের সঙ্গে করতে শিখবে। আমরা বড়রা কাজকে খেলা থেকে ভিন্ন করি এবং কাজকে বর্জন এবং খেলাকে গ্রহণ করায় আনন্দ বোধ করে থাকি। আমাদের এই প্রবৃত্তি সঞ্চারিত হয় শিশুর মনে। শরীর-শ্রমের প্রতি বিতৃষ্ণা এই কৃত্রিম মনোভাব শিশুর মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ারই ফল। পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষায় প্রধান কাজ হিসাবে নিম্নলিখিত কাজগুলিকে গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

১। গৃহ-কাজ—যেমন রান্না করা, কাপড় কাচা, ঝাড়ু দেওয়া, ধোয়া মোছা পরিষ্কার করা, সাজান গোছান ইত্যাদি।

২। ব্যক্তিগত ও সামুদায়িক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কাজ।

৩। বাগানের কাজ।

৪। কাপড় তৈরীর কাজ।

তাছাড়াও স্থানীয় পরিবেশ অনুসারে বিভিন্ন কাজ পূর্ব-বুনিয়াদী কেন্দ্রে নেওয়া যেতে পারে। মাটি, বালু, কাঠের টুকরা ইত্যাদি নিয়ে খেলা তো সেখানে থাকবেই।

পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষায় ভাষা শেখার ব্যাপারে লেখাপড়ার ওপর মোটেই জোর দেওয়া হয়নি। বুনিয়াদী শিক্ষার পর্যায়েই শিশুরা

সাধারণতঃ লিখতে পড়তে শিখবে, তবে শিশুর মনে এ সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ এলে সেটাকে পূর্ব-বুনিয়াদী স্তরে জোর ক'রে চেপে রাখা হবে তাও নয়। পূর্ব-বুনিয়াদী স্তরে এই ব্যাপারে বিশেষ নজর দেওয়া হবে উচ্চারণ ও আত্মপ্রকাশের সাবলীলতা ও বিশুদ্ধতার ওপরে। শিশু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই বয়সে যে পরিবেশ ও কাজের সঙ্গে পরিচিত হবে তাকে ভাষায় প্রকাশ করার মত শব্দভাণ্ডারের সঙ্গে তার এই বয়সে পরিচিত হওয়া চাই। শিক্ষার জন্য কোন মতে কতকগুলি শব্দকে এই বয়সে তার মগজে গুঁজে দেওয়া হবে না, জীবনের প্রয়োজনে শিক্ষার ভাণ্ডার তার কাছে একটু একটু ক'রে উন্মুক্ত করা হবে। বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় গান, কবিতা, অভিনয় ইত্যাদিকে কেন্দ্র ক'রে শিশুর শব্দভাণ্ডার ক্রমশঃ পুষ্ট হতে থাকবে।

পূর্ব-বুনিয়াদী স্তরে পুঁথি ধ'রে অঙ্ক বা বিজ্ঞানের শিক্ষা মোটেই দেওয়া হবে না। তবে এই পর্যায়ে বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে হিসাব করবার অভ্যাস, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার অভ্যাস শিশুর জীবনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। শিশুর মনে প্রতিটি কাজের ভিতর দিয়ে প্রশ্নবোধ জাগ্রত করতে হবে এবং প্রশ্নের সমাধানকে আয়ত্ত করার জন্য নিবিষ্টমনে সানন্দে শ্রম করার অভ্যাসকে দৃঢ়মূল করতে হবে। আমরা সাধারণতঃ ধমক দিয়ে শিশুর প্রশ্ন-বোধকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করি, শিশুর জীবনে এর চাইতে সর্বনাশ আর কিছুই নেই। হিসাব না ক'রে এবং কারণ না বুঝে কোন কাজই যে সুষ্ঠুভাবে করা যেতে পারে না এ বোধটা শিশুর মনে প্রত্যক্ষ কাজের মধ্য দিয়ে প্রথমাবধি জাগ্রত করতে

হবে। পূর্ব-বুনিয়াদী পর্যায়ে এই হবে অঙ্ক আর বিজ্ঞানের শিক্ষা।

চিত্র এবং সঙ্গীত হবে পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। শিশু ছবি আঁকবে মনের আনন্দে। শিক্ষক তাকে ফরমাশও দেবেন না আর শুদ্ধও ক'রে দেবেন না। শিক্ষকের কাজ হবে তাকে প্রয়োজনীয় উপকরণ এগিয়ে দেওয়া, সে যাতে বিনা বাধায় নিবিষ্ট মনে কাজ করতে পারে তেমন পরিবেশ তৈরী ক'রে রাখা। ছবি আঁকা বা গানের বেলার শাস্ত্রীয় শিক্ষাটা বড় কথা হবে না—বড় কথা হবে শিশুর আনন্দময় আত্মপ্রকাশ। তার আত্মপ্রকাশের যোগ্য ক'রেই তার সামনে নৃত্য গীতের ভাণ্ডার ধরতে হবে। লোকনৃত্য, ব্রতচারী, বিভিন্ন কাজকে উপলক্ষ ক'রে গান এই পর্যায়ে প্রচুর শিক্ষা দিতে হবে।

পূর্ব-বুনিয়াদী পর্যায়ে শিশুরা হাঁস, পায়রা, মুরগী, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি নানা রকমের জন্তু পুষতে শিখবে। এদের খাবার দেওয়া, যত্ন করা ইত্যাদির কাজে এরা অংশ গ্রহণ করবে। গৃহস্থের বাড়ীতে জীবনের অপরিহার্য অংশরূপে কিছু কিছু জীবজন্তু থাকবেই; এদের পরিচর্যায় শিশুরা প্রথমাবধি অংশ গ্রহণ করতে শিখবে।

পূর্ব-বুনিয়াদী পর্যায়ে শিশুর আত্মিক বিকাশের কথাও পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষাসমিতি বলেছেন। ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকটা বিদ্যালয়ে মোটেই শিক্ষা দেওয়া হবে না। আত্মার শিক্ষাটা এখানে হবে অপরকে ভালবাসতে শেখা। পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রে ভালবাসা, পক্ষপাতহীন বিচার, পারস্পরিক সহায়তা এবং সমবায়মূলক কাজের

একটা আবহাওয়া থাকবে। এর মধ্য দিয়ে শিশুর মন সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বাত্মাবোধের দিকে এগিয়ে যাবে। শিশু প্রথমাবধি পরমতসহিষ্ণু হতে এবং নিজেকে একটা বৃহত্তর সমাজের অঙ্গ ব'লে ভাবতে শিখবে, নিজের মঙ্গলকে সে বৃহত্তর সমাজের মঙ্গল থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখতে শিখবে না।

এ সব বিষয়েই পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষাসমিতির সদস্যরা প্রায় একমত ছিলেন। পূর্বেই বলেছি, এই সমিতিতে মাদাম মন্তেসরির পদ্ধতিতে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাসী অনেকে ছিলেন। ৭ বছরের কম বয়সের শিশুদের শিক্ষার কাজ নিয়ে ভারতবর্ষে এর কিছু আগে থেকেই কাজ সুরু হয়েছিল বলেছি। যে সব প্রতিষ্ঠান এই কাজ করছিলেন 'নূতন বালশিক্ষণসঙ্ঘ' তাদের মধ্যে প্রধানতম। এই সঙ্ঘের সভানেত্রী শ্রীসরলাদেবী সরাভাই এবং সম্পাদিকা তারাবেন মোড়ক পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষাসমিতির সভ্যা ছিলেন। শ্রীযুক্তা সরলাদেবীর আমন্ত্রণে মাদাম মন্তেসরি ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং নিজের হাতে ভারতবর্ষে শিশুশিক্ষার কর্মী গড়ে তুলেছিলেন। মাদাম মন্তেসরি-পদ্ধতিতে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাসী কর্মীদের সঙ্গে হিন্দুস্থানী তালীমী সঙ্ঘের কর্মীদের তিনটি প্রধান বিষয়ে মতভেদ হয়। প্রথমতঃ, মাদাম মন্তেসরি শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষালয়ের জন্য ঘর-বাড়ীর ওপর খুব জোর দেন। এরকম ঘর-বাড়ী ও আসবাবপত্র বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ, শিশুদের এই পর্যায়ের শিক্ষায় মাদাম মন্তেসরি লেখাপড়ার ওপর খানিকটা জোর দেবার পক্ষপাতী। তৃতীয়তঃ, মাদাম মন্তেসরি শিশুদের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে আলাদা আলাদা ক'রে শিক্ষা দেওয়া এবং তার জন্য নিখুঁত পূর্বনির্দিষ্ট সরঞ্জাম ব্যবহার করা অপরিহার্য

বলে মনে করেন। এ বিষয়ে মহাবালেশ্বরে গান্ধীজীর সঙ্গে মাদাম মন্তেসরির সাক্ষাৎ হয়। গান্ধীজী এসব বিষয়ে তাঁর মূলনীতির আলোচনা করেন। তাঁর মতে :

(১) শিশুকে তার পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে তার শিক্ষা সার্থক হবে না। শিশু তার পরিবেশকে ঘৃণাই করতে শিখবে, সে পরিবেশকে এড়াতেই শিখবে, তাকে নিজের শিক্ষা ও শক্তির সাহায্যে রূপান্তরিত করতে শিখবে না। সুতরাং স্থানীয় পরিবেশের এবং সামর্থের দিকে দৃষ্টি রেখে স্থানীয় উপকরণে স্বল্প ব্যয়ে উপযুক্ত ঘর-বাড়ী তৈরী করতে হবে। এজন্য অনেক খরচ ক'রে ভাল ঘর-বাড়ী, দামী আসবাব-পত্র, প্রকাণ্ড ডাক্তারখানা তৈরী করার পক্ষপাতী তিনি নন। বৈজ্ঞানিক মন দিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে, বিজ্ঞানের শিক্ষাকে আমাদের পুরোপুরি কাজে লাগাতে হবে, কিন্তু স্থানীয় সামর্থের বাইরে আমাদের যাওয়া চলবে না ; কারণ তাহলে গ্রামে গ্রামে প্রত্যেকটি শিশুর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না, আর সেটাই হচ্ছে প্রধান উদ্দেশ্য।

(২) ৭ বৎসরের কম বয়সের শিশুর শিক্ষায় লেখাপড়া প্রধান স্থান পেতে পারে না। এই বয়সের শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে মুখে মুখে। তবে কোন শিশু বিশেষ আগ্রহ দেখালে তাতে বাধা দেবারও কিছু নেই। মোট কথা, এ বিষয়ে তাগিদ আসবে সম্পূর্ণভাবে শিশুর তরফ থাকে। এ বিষয়ে পরিবেশ তৈরী করার দিকেও শিক্ষকের বিশেষ মনোযোগ দেবার প্রয়োজন নেই।

(৩) সরঞ্জাম স্থানীয় উপকরণে অবশ্যই হওয়া চাই। শিক্ষক গ্রামের শিল্পীকে দিয়ে সরঞ্জাম তৈরী করিয়ে নেবেন। সরঞ্জাম

নিখুঁত হবে না। শিশুও যাতে সরঞ্জাম তৈরী করাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। নিখুঁত এবং মূল্যবান সরঞ্জামের সঙ্গে অনেক বাধা-নিষেধ জড়ান থাকে, তা শিশুর বিকাশের পক্ষে সহায়ক নয়। সর্বোপরি দামী সরঞ্জাম এবং সার্বজনীন শিক্ষা ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় স্ববিরোধী, সুতরাং পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষাসমিতির উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করায় এর বাস্তব প্রয়োগ অসম্ভব।

পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষাসমিতি গান্ধীজীর মতকেই গ্রহণ করেন। উড়িষ্যা, বিহার, বোম্বাই, উত্তর প্রদেশ ও গুজরাটে পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষার সামান্য প্রয়োগ সুরু হয়। সেবাগ্রামে গান্ধীজীর তত্ত্বাবধানে ও শ্রীশান্তা নারুলকরের পরিচালনায় হিন্দুস্থানী তালীমী সঙ্ঘ পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষার পরীক্ষা আরম্ভ করেন। এই প্রয়োগের ফলে শান্তা দেবী পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য নিম্নলিখিত সরঞ্জামগুলি সুপারিশ করেছেন ঃ

(ক) শিশুদের সাফাইয়ের সরঞ্জাম ঃ

১। মাথা পরিষ্কার করার জিনিষ—আয়না, চিরুণী, তেলের কৌটা, রীঠা ইত্যাদি।

২। নখ পরিষ্কারের জন্য—কাঁচি ও তোয়ালে।

৩। হাত-পা ধোয়ার জন্য—বালতি, মগ, বসবার টুল, তোয়ালে ইত্যাদি।

৪। স্নানের জন্য—কাপড় ভিজাইবার পাত্র, সাবান, সোডা, রীঠা, কাপড় শুকাইবার জন্য বাঁশ, তার ইত্যাদি।

(খ) শিশুরা যে সাফাই কাজ করবে তার সরঞ্জাম :

১। প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করার জন্য—ঝাড়ু, টুকরী, খুরপী, কোদাল ইত্যাদি।

২। ঘর পরিষ্কার করার জন্য—বাঁশে বাঁধা ঝাড়ু, ছোট ছোট ঝাড়ু ইত্যাদি।

(গ) বিভিন্ন কাজের সরঞ্জাম :

১। মাটির কাজের জন্য—কাদা, বাঁশের কাঠি ও ছুরি, ইটের ফরমা ইত্যাদি।

২। রঙের কাজের জন্য—বিভিন্ন রঙের মাটি, রঙ রাখার এবং রঙ ভেজাবার বাসন, তুলি, গঁদ ইত্যাদি।

৩। সূতা কাটার বিভিন্ন সরঞ্জাম—বাঁশ, ছুরি, তূলা, চুপড়ী, তকলী, নাটাই, দণ্ডী ইত্যাদি।

৪। সেলাইয়ের জন্য—সূতা, সূঁচ, সেলাইয়ের বাক্স ইত্যাদি।

৫। আনাজ বাছা ও তরকারী কাটার জন্য—থালা, টুকরী, ছুরি, বেলুন, চাকী ইত্যাদি।

৬। বাগানের সরঞ্জাম—কোদাল, নিড়ানি, খুরপী, জলের ঝারি ইত্যাদি।

(ঘ) ইন্দ্রিয় শিক্ষার জন্য সরঞ্জাম :

১। চোখের জন্য—প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু, বিভিন্ন রঙ, চোখ বাঁধার জন্য কাপড়।

২। কাণের জন্য—সঙ্গীত-যন্ত্র।

৩। স্পর্শের জন্য—মার্বেল কাগজ, বিভিন্ন বস্তু, মিহি মোটা বিভিন্ন রকমের কাপড়ের টুকরা।

৪। স্বাদের জন্য—ফিটকারী, নূন, গুড়, গোলমরিচ, নিমের পাতা, তেঁতুল ইত্যাদি।

৫। গন্ধের জন্য—ফুল, পাতা ইত্যাদি।

(ঙ) পানীয় জলের সরঞ্জাম :

হাঁড়ী, ছাঁকনীর কাপড়, গ্লাস, জল তোলার সরঞ্জাম।

(চ) খেলার সরঞ্জাম :

লোকনৃত্যের জন্য কাঠি লাঠি ইত্যাদি, ঢোলক, নূপুর, খঞ্জনী, লাফাবার দড়ি, লাফঝাঁপের ব্যবস্থা, সিঁড়ি ইত্যাদি।

(ছ) বসবার ও জিনিষপত্র রাখবার সরঞ্জাম :

উপরোক্ত সবগুলি জিনিষই সহজে সংগ্রহ করা বা গ্রামে তৈরী করে নেওয়া সম্ভব।

শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের জন্য আজ জাতির চরিত্র ভেঙ্গে পড়েছে। স্বাধীন ভারতের সামনে এইটেই সব চাইতে বড় সমস্যা। ভিক্ষা দিয়ে, বিদেশ থেকে জাহাজ বোঝাই খাদ্যশস্য এনে, কঠোর শাসনে দেশকে সায়েস্তা করার চেষ্টা ক'রে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে না। দেশের পুঞ্জীভূত সমস্যার সমাধান হবে কাকে দিয়ে? যাদের দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে হবে তাদেরই মনের মধ্যে ঘুণ ধরেছে। এই মূল রোগের মূল চিকিৎসা চাই। দীর্ঘমেয়াদী হলেও জাতীয় সমস্যার এই একমাত্র সমাধান। রাষ্ট্র-পরিচালনার দায়িত্ব

যাঁদের, তাঁদের এই দিকে মনোযোগ দিতেই হবে। আশু সমস্যার চাপে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যদি তাঁরা এই মূল সমস্যাটির দিকে দৃষ্টিপাত না করেন তবে নষ্ট চরিত্রের বিকৃতি পুঞ্জীভূত হয়ে জাতির মঙ্গলকে গ্রাস করবে। শিশুকে বাঁচিয়ে, তাকে ভবিষ্যৎ সমাজের আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন স্বাবলম্বী মানব-প্রেমী নাগরিকরূপে গড়ে তোলার পরিপূর্ণ সুযোগ দিয়ে আজকের আত্মধ্বংসী সভ্যতার কবল থেকে নিষ্কৃতিলাভ করার সুমতি আমাদের হ'ক।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংগঠন

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজ কি ভাবে আরম্ভ করা হবে বুনিয়াদী শিক্ষাকর্মীর কাছে এটা একটা খুব জরুরী প্রশ্ন। বুনিয়াদী বিদ্যালয় আরম্ভ করতে গিয়ে কর্মীকে প্রায়ই প্রচণ্ড ধাক্কা খেতে হয়। জনমন রক্ষণশীল। বহুদিনের অভ্যাসে জনসাধারণ যাকে শিক্ষা ব'লে জেনে এসেছেন তার কোন পরিবর্তনে স্বভাবতঃই এঁদের দ্বিধা। গুরুমশাইর বেত্র এবং সাশ্রুনয়নে বিদ্যার্থীর কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া ইত্যাদি মুখস্থ করার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা ছাড়া যে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ চলতে পারে সেটা এঁদের কল্পনার বাইরে। তাই খেলাধূলা, হুটোপুটি, সাফাই, সূতাকাটা আর কৃষিকাজের অভূতপূর্ব কর্মসূচী নিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষাকর্মী যখন কাজ করতে সুরু করেন তখন গ্রামবাসীরা ছেলেপিলেদের ভবিষ্যৎ ঝরঝরে হয়ে যাচ্ছে আশঙ্কা ক'রে শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং সরকারী আইনের ভয়ে মুখ ফুটে সক্রিয় প্রতিবাদ না করলেও তলে তলে নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে পড়েন। সাফাই, সূতাকাটা, বাগানের কাজ, খেলাধূলা প্রভৃতি যে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু হতে পারে এবং এর মধ্য দিয়ে যে শিশুকে উচ্চশিক্ষার দিকে নিয়ে যাওয়া যায় একথা আমাদের দেশে খুব কম লোকেই বিশ্বাস করেন। ফলে অধিকাংশ গ্রামে অতি সামান্যসংখ্যক মাত্র শিশু উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেলেও

অধিকাংশ গ্রামে অধিবাসীরা এই যুক্তিতে বুনিয়াদী শিক্ষার বিরোধিতা করে থাকেন।

এমন অবস্থায় বুনিয়াদী শিক্ষাকর্মীর কর্তব্য কি ?

শিক্ষাদীক্ষাহীন তথাকথিত অনগ্রসর গ্রামে গিয়ে বুনিয়াদী-শিক্ষার কাজ আরম্ভ করলেই যে সমস্যা এড়ান যায়, তা নয়। সে সব ক্ষেত্রে গ্রামবাসীরা প্রায়ই মনে ক'রে থাকেন যে, তাঁদের উন্নতির পথকে রুদ্ধ করার জন্যই শিক্ষিতদের এটা একটা ষড়যন্ত্র। স্কুল-কলেজের লেখাপড়া শেখাকেই তাঁরা শিক্ষা বলে জেনে এসেছেন ; তাই বুনিয়াদী শিক্ষাকর্মীর সঙ্গে তাঁরা অসহযোগই ক'রে থাকেন। আশেপাশের গ্রামে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলে তাঁদের এই শঙ্কা আরও দৃঢ় হয় এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে এড়িয়ে সেরকম বিদ্যালয়েই তাঁদের সন্তান-সন্ততিকে পাঠাবার চেষ্টা ক'রে থাকেন।

এই বিমুখতাকে দূর করতে হলে যা করা প্রয়োজন তা বুনিয়াদী শিক্ষার একটি মূল কথা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সহায়তা নিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষাকে জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া এই শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার পক্ষে সহায়ক নয়। যে জিনিষটার নিজস্ব মূল্য কম, তাকেই চাকচিক্য দিয়ে ঢাকতে হয়, বলপ্রয়োগে গ্রহণযোগ্য করতে হয়। যা ভাল যা মঙ্গলকর, তাকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য ক্ষমতার ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন। তাছাড়া কোন গণতান্ত্রিক দেশে জনসাধারণ যার প্রতি বিমুখ, সরকার তাকে কার্যকরী করতে পারে না। জোর ক'রে সরকারী আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা যেখানে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত সেখানেই সম্ভব। বুনিয়াদী শিক্ষা ও একনায়কত্ব

মূলতঃ স্ববিরোধী। তাই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতিষ্ঠায় সরকারী সহায়তা সম্পর্কে স্বপ্ন রচনা না করাই বুনিয়াদী শিক্ষাকর্মীর পক্ষে কল্যাণকর। বুনিয়াদী শিক্ষার উৎকর্ষ শিক্ষাকর্মীকে জনসাধারণের নিকট প্রমাণিত করতে হবে তাঁর নিজের জীবনের উদাহরণ দিয়ে। জনসাধারণ এই আদর্শ দেখে অনুপ্রাণিত হবেন, এগিয়ে আসবেন বুনিয়াদী শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার আগ্রহ নিয়ে, তাঁদের আগ্রহ ও সৃজনশক্তিকে সংগঠিত করে ও কার্যকরী করে আদর্শ বুনিয়াদী বিদ্যালয় গড়ে উঠবে। এ বিষয়ে গান্ধীজী নিখিল ভারত বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে যে বাণী পাঠিয়েছিলেন তা সকল বুনিয়াদী শিক্ষাকর্মীর প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন: "আমি আশা করি, এই সভা উপলব্ধি করবেন যে আমাদের এই প্রচেষ্টার সাফল্য সরকারী সহায়তা অপেক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার উপরই অধিকতর নির্ভর করে,—সরকার ইচ্ছুক হলেও সতর্ক হতেই হবে। আমাদের পরীক্ষাকে সুসম্পূর্ণ করতে হলে অন্ততঃ কোথাও একে বাইরের হস্তক্ষেপ এবং ভেজাল থেকে মুক্ত রাখতে হবে।"* প্রত্যেক প্রদেশেই অন্ততঃ দুচারটি কেন্দ্র প্রধানতঃ স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রয়োজন। অবশ্য সরকারী বিরূপতা সকল গঠনকর্মেরই সার্থকতার পরিপন্থী। আমাদের স্বাধীনতা এইখানেই আমাদের সহায়ক হতে পারে এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা

* "I hope that the conference will realise that success of the effort is dependent more upon self-help than upon Government, which must necessarily be cautious even when it is well disposed. Our experiment to be thorough has to be at least somewhere made whithout alloy and without outside interference."

ও সরকারী সহায়তা এখানেই আমাদের শিক্ষাবিপ্লবকে সার্থক করে তুলতে পারে।

পূর্ব-প্রস্তুতি

গ্রামে গিয়েই বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন নয়। বিকেন্দ্রিত সমাজগঠন বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য। কেবলমাত্র সরকারের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার সাহায্যে বিদ্যালয় গড়ে উঠলে প্রথম পাদক্ষেপেই বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্বধর্মচ্যুত হবে। যা কিছু গড়ে তোলার মূলে রয়েছে শ্রমশক্তি। এই শ্রমশক্তির কোন অভাব গ্রামে নেই, অভাব রয়েছে প্রয়োজনবোধের। এই অভাববোধ জাগ্রত হলে সন্তান-সন্ততির শ্রেষ্ঠ শিক্ষার ব্যবস্থা যে গ্রামবাসীরা নিজেদের শক্তিতেই করতে পারেন, তার জন্য যে পদে পদে পরের দ্বারস্থ হতে হয় না এটা প্রতিষ্ঠা করাই বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য।

একান্তভাবে কেন্দ্রীয় সাহায্যে বিদ্যালয় গড়ে তোলার সর্ব-প্রধান ক্ষতি এই যে এই সাহায্য জনমনে আফিংএর মত বিষ-ক্রিয়া করে। নিজের সন্তানদের শিক্ষা দেবার দায়িত্ব ও কর্তব্য যে পিতামাতার, এই শিক্ষা যাতে সৎশিক্ষা হয় সে বিষয়ে দেখা এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা যে তাঁদের কর্তব্য এবং ব্যবস্থা করার শক্তি যে সত্যই তাঁদের আছে—এই কথা ক্রমশঃ জনসাধারণ ভুলে যেতে থাকেন। এভাবে কেন্দ্রীয়সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা ক্রমশঃ জনমনকে ভিক্ষুকের মত পরনির্ভরশীল করে তোলে। তাঁরা একবারও মনে করতে পারেন না যে সরকারী অর্থভাণ্ডারের স্রষ্টা তাঁরা নিজেরাই। সরকারী টাঁকশালে ঐশ্বর্য সৃষ্টি হয় না, হয়

জনসাধারণের শ্রমোৎপাদিত দ্রব্যসম্ভারের দ্বারা। কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থায় যাঁরা ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেন তাঁরা তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হন। এই অর্থের অধিকাংশ ব্যয়িত হয়ে যায়—যাঁরা কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার সংগঠন যন্ত্রটিকে করায়ত্ত করে বসে থাকেন তাঁদের বিলাসের জন্য। তহশীলদার থেকে রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত ছোটবড় সকল কর্মচারীর চাহিদা মিটিয়ে উৎপাদনকারীর অর্থ যখন উৎপাদনকারীরই সেবায় লাগে তখন টাকায় ১ আনাও বাঁচে কিনা সন্দেহ। এ অন্যায় সম্পর্কে জনসাধারণ সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলেই সামান্য সরকারী সাহায্য পেয়েও তাঁরা কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে পড়েন।

এই কৃতজ্ঞতা থেকে যে ঔদাসীন্যের সৃষ্টি হয় সেটাই সবচেয়ে মারাত্মক। এই জগদ্দল পাথরের মত অনড় ঔদাসীন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করাই বুনিয়াদী শিক্ষাকর্মীর সর্বপ্রথম কাজ। এ কাজের জন্য বয়স্ক-শিক্ষা প্রয়োজন। এই বয়স্ক-শিক্ষাও বিদ্যালয় ফেঁদে মামুলী ছাঁদে করলে চলবে না। সারাদিনের কর্মক্লান্ত গ্রামীণ জনসাধারণ বিদ্যালয়ে এসে পাঠ নেবেন, এটা আশা করা মূর্খতা। এরকম বিদ্যালয় খোলার অত্যুৎসাহ খড়ের আগুনের মত যেমন দপ্ করে জ্বলে ওঠে তেমনি টপ্ করে নিভে যায়, এর প্রমাণের কোন অভাব নেই। এরকম বিদ্যালয় গড়ার চেষ্টায় যে অর্থব্যয় হয়ে থাকে তাকে অপব্যয় বললে অন্যায় হয় না। এরকম বিদ্যালয়ে বয়স্করা এসে নিয়মিত পাঠ নেবেন, এই আশার মধ্যে বয়স্কদের শিক্ষা সম্পর্কে যতখানি অভাববোধ ও সচেতনতা আছে বলে ধরে নেওয়া হয় তা থাকলে বুনিয়াদী শিক্ষার মুখবন্ধ হিসাবে লোকশিক্ষার প্রয়োজন এত তীব্র হত না।

এই বয়স্ক-শিক্ষার ব্যবস্থার তুটি বিশেষত্ব থাকা প্রয়োজন : (১) কর্মীকে নিজের জীবনের আদর্শ দিয়ে গ্রামবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে! চলতি শিক্ষায় কেবলমাত্র উপদেশ বিতরণের ভারই শিক্ষকের, সেই উপদেশ অনুসারে নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার দায়িত্ব তাঁর নেই। ফলে অনেক ভাল ভাল কথা তিনি বলেন বটে কিন্তু কাজে তার কিছুই করেন না। কথা ও কাজে, আদর্শ ও জীবনে এই অসঙ্গতি শিক্ষার কার্যকরী হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। গ্রাম-সেবার কাজ আরম্ভ করার আগে গান্ধীজী একজন বিশিষ্ট কর্মীকে বলেছিলেন : "বুনিয়াদী শিক্ষক গ্রামে যাবেন শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে নয়, সমগ্র গ্রামের শিক্ষক হয়ে। গ্রামের সর্বপ্রকার সমস্যার সমাধানে সহায়তা করা হবে তাঁর লক্ষ্য।" গ্রামের লোক বছরে প্রায় ৮মাস বেকার বসে থাকেন ; শিক্ষক তাঁর নিজের জন্য সারা বছরের কর্মের সংস্থান করে আদর্শ দেখাবেন। অসুস্থতার জন্য গ্রামের লোকের শ্রমশক্তি কমে যায় ; শিক্ষককে এই গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে সুস্থ থাকার পথ দেখাতে হবে। গ্রামের লোক পরিবেশকে নোংরা করে রাখেন, ঐশ্বর্যকে রোগের আকরে পরিণত করেন ; শিক্ষককে সেই পরিবেশকে সুন্দর করে তোলার পথ দেখাতে হবে, অবজ্ঞাত নোংরা পদার্থকে ঐশ্বর্যে পরিণত করার পথের সন্ধান দিতে হবে। শিক্ষা মানুষকে উন্নততর জীবন যাপনের সামর্থ দেয়, তাকে তার পরিবেশের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের শক্তি দেয়, এ বোধ লোকের জীবনে জাগ্রত হবে শিক্ষকের বাস্তব জীবন দেখে। শিক্ষাই যে শক্তি, শিক্ষা যে বাস্তব জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনগুলিও সুষ্ঠুভাবে মেটাবার জন্য অপরিহার্য, এ বোধ জনমতে জাগ্রত করা চাই। (২) দ্বিতীয়তঃ

এই জনশিক্ষা হবে সচল ; অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট স্থানে এসে জনসাধারণ শিক্ষা লাভ করবেন প্রথমেই এমনটি হবে না। শিক্ষককেই ঘুরে বেড়াতে হবে সারা গ্রামে। প্রতিদিন তিনি অন্ততঃ একবার সমগ্র গ্রামটা ঘুরবেন, সকলের কুশলপ্রশ্ন করবেন। শিক্ষক অন্য কিছু করতে পারুন আর না পারুন, মিষ্টিমুখে প্রত্যেকের সুখদুঃখের কথা শোনা ও তাদের যথাসাধ্য বুদ্ধি পরামর্শ দেওয়াও বড় কম কাজ নয়। শিক্ষককে এই প্রাত্যহিক ভ্রমণের ও কথোপকথনের দিনলিপি রাখতে হবে। শোকে সান্ত্বনা, রোগে শুশ্রূষা, অভাবে প্রতিকারের পথ-নির্দেশ করে শিক্ষক গ্রামকে আপন করে নিতে পারবেন ; অপর দিকে দিনলিপির আলোচনাকে ভিত্তি করে গ্রামের সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ, সমস্যা ও প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্পষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত হয়ে উঠবে। যদি শিক্ষকের কাছে গ্রামের লোকেরা ক্রমে এসে জুটতে আরম্ভ করেন তবে তাঁরা আসবেন শিক্ষকের ঘরে তাঁদের বিদ্যা-শিক্ষার স্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বলে নয়, সেখানকার পরিবেশে খানিকটা সময় কাটিয়ে গেলে তাঁদের আনন্দ হয় বলে ; অর্থাৎ নিয়মের নিগড় নয়, ভালবাসার আকর্ষণই হবে শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠার কারণ।

বিদ্যালয় গড়ে তোলার এই প্রাথমিক প্রস্তুতির কাজ শিক্ষক কতদিনে করে উঠতে পারবেন তা নির্ভর করবে তাঁর শক্তি, শিক্ষা ও পরিবেশের উপর। কিন্তু অন্ততঃ এক বৎসরের কম সময়ে গ্রাম-সমাজের সামনে শিক্ষার এই শক্তির পরিচয়কে প্রতিষ্ঠা করা এবং অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এর অর্থ এই নয় যে এক বছরের মধ্যে বিদ্যালয়ের কাজ কিছুমাত্র আরম্ভ হবে না ; আসল

কথা, বিদ্যালয়ে ছাত্র আসবে বাইরের চাপে নয়, বিদ্যালয়ের আকর্ষণে। আমরা বিদ্যালয়ের হাজিরা খাতা দিয়ে বিদ্যালয় সংগঠনের পরিমাপ করে থাকি, আমাদের এই হিসাবে মস্ত বড় একটা ফাঁকি আছে। আইন করে বিদ্যালয়ে ছাত্র আনার মধ্যে যে বিদ্যালয় ও অভিভাবকদের মধ্যে অসহযোগিতার প্রশ্ন রয়েছে সেটাকে আমরা এড়িয়ে যাই। অন্যান্য প্রগতিশীল দেশে আইন করা হয়েছে, এটাই একটা বড় যুক্তি নয়। কোন বাপ মা শিক্ষার প্রয়োজন বোঝা সত্ত্বেও এবং সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাবার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও বিদ্যালয়ে পাঠাতে চান না, এ কথা অশ্রদ্ধেয়। হয় তাঁদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব থাকে, নয় থাকে সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাবার সামর্থের অভাব। আমাদের দেশে এ দুটো কারণই রয়েছে। এ অবস্থায় আইন করে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা বা বাধ্যতামূলক উপস্থিতির ব্যবস্থা করা কেবল অবান্তর নয়, নানারকম ক্ষতির কারণ হতে পারে। কেন্দ্রীভূত সমাজব্যবস্থায় গরীব চাষী বা শ্রমিককে শোষণ করে বিরাট রাষ্ট্র-যন্ত্রের সুরম্য হর্ম্য রচিত হয়। ফলে রাষ্ট্রের ভিত্তি যাদের উপর গড়ে ওঠে তাদের সামর্থ থাকে না নিজের চেষ্টায় কোন কিছু গড়ে তোলার। ফলে তাদেরই ধনের সামান্য একটা অংশ তাদেরই দান করার ভান করে তাদের সভ্যভাবে বাঁচিয়ে রাখার ভান করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি আইন করে যারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম-শ্রেণীতে ভর্তি হবে তাদের চতুর্থশ্রেণী পর্যন্ত বরাবর উপস্থিত হওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের এটাই হচ্ছে পূর্ব-প্রস্তুতি। এই আইনের পিছনে জাতীয় শিক্ষাকে

সার্বজনীন করে তোলার যে প্রচেষ্টা রয়েছে তা মহৎ সন্দেহ নেই; কিন্তু বাস্তবে এই আইনের ফল কি হবে? প্রথমতঃ বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠাবার মত সামর্থ আজ অধিকাংশ গ্রামবাসীরই নেই। ভারতবর্ষে গ্রামের শতকরা ৯৫ জন লোক কৃষিজীবী। বর্তমান আর্থিক সংগঠনে কৃষক তার ফসল থেকে বাঁচবার মত মজুরীও পাচ্ছে না। ফলে নিজের সন্তান সন্ততিকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগিয়ে বাইরের মজুর কেনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া তার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। তাই বুদ্ধি বা শক্তি যতই থাক না কেন, গ্রামবাসীর সন্তানসন্ততির প্রায় সকলকেই আজ পাঠশালায় পড়ার বয়সেই মজুরী খেটে নিজের ভার অন্ততঃ আংশিকভাবে বহন করতে হয়। এই অর্থ নৈতিক অবস্থাকে বজায় রেখে সরকার যদি বাধ্যতামূলক-উপস্থিতি-আইন প্রণয়ন করেন এবং তাকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন তবে দেশের শিক্ষিতের হার কমবে মাত্র, আর তার সঙ্গে ব্যাপক দুর্নীতি প্রবেশ করবে শিক্ষার ক্ষেত্রে। একে তো অভিভাবকদের শিক্ষা সম্পর্কে প্রচুর ঔদাসীন্য রয়েছে, তাছাড়া যদি সন্তানকে একবার বিদ্যালয়ে দিলে তাকে ৫ বছর বিদ্যালয়ে রাখতে বাধ্য হতে হয়, তবে বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা আবশ্যিকভাবেই কমবে। অপর পক্ষে নিম্নতম একটা ছাত্র-সংখ্যা ও গড় উপস্থিতি দেখাতে না পারলে শিক্ষকের সাহায্য প্রাপ্তি ও বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব রক্ষা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। ফলে শিক্ষকরাও মহাজনদের পন্থা অনুসরণ করে কাল খাতা রাখতে পোক্ত হয়ে উঠবেন। এই সঙ্কটকে এড়াতে হলে বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা বাড়ানর উপর জোর না দিয়ে শিক্ষাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টার দিকে জোর দিতে হবে।

শিক্ষাকে চিত্তাকর্ষক ও অভিভাবকদের প্রভাবিত করে বিদ্যালয়কে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করার এবং উৎপাদনমূলক কাজ, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে কেন্দ্র করে শিক্ষা দেবার পূর্ব-প্রস্তুতি হিসাবে শিক্ষাকর্মীদের নিম্নলিখিত কাজগুলি করা দরকার হবে।

(১) **আদর্শ জীবন যাপন ঃ** বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য জীবন-গঠন, কেবলমাত্র সংবাদ-বিতরণ নয়। শুধু উপদেশ ছড়াতে হলে পুঁথিপড়া বিদ্যাই হয়তো যথেষ্ট। কিন্তু মানুষের জীবন-গঠনই লক্ষ্য হলে শিক্ষকের দীর্ঘ আত্মপ্রস্তুতি প্রয়োজন। আত্মপ্রস্তুতি ছাড়া শিক্ষক শিক্ষাদানের অধিকারী হতে পারেন না। শিক্ষার্থী মুখের কথা শুনে শেখে না, শেখে শিক্ষকের আচরণ দেখে। এজন্য বুনিয়াদী শিক্ষাকর্মীর প্রথম কাজ এই যে, যোগ্য শিক্ষা থাকলে কিভাবে গ্রামের পরিবেশ ও আর্থিক অবস্থার মধ্যেই আদর্শ জীবন যাপন করা যেতে পারে তা জীবনে প্রমাণিত করা।

(ক) এজন্য প্রথমতঃ গ্রামের উপাদানে আদর্শ গৃহনির্মাণ করতে হবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের বেলায় এ কথাটা আমরা প্রায়ই মনে রাখি না। বুনিয়াদী শিক্ষার মারফতে গ্রামের সামনে যে আদর্শ রাখতে হবে তা এমন হওয়া চাই যা গ্রামের দীনতম ব্যক্তিও গ্রহণ করতে পারে। গান্ধীজীর চিন্তাধারায় যে সমাজ-বিপ্লবের পরিকল্পনা পাই এটি তার একটি মূল কথা। গ্রামের সামনে গ্রামের লোকের পক্ষে সহজ-সাধ্য কোন আদর্শ দেওয়া যদি সম্ভব না হয়, তবে বুঝতে হবে গ্রামকে দেবার মত এ বিষয়ে বুনিয়াদী শিক্ষার কিছুই নেই। ইট, সিমেণ্ট ইত্যাদি ছাড়া যদি আদর্শ গৃহনির্মাণ সম্ভব না হয়, তবে গ্রামকে আদর্শ গৃহ-নির্মাণের

শিক্ষা দিতে যাওয়া ব্যর্থ হবে। এ যেন শেয়াল আর সারসের পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করার গল্পের মতই ব্যাপার হবে কতকটা। এ সম্পর্কে অনেকে স্থায়িত্ব ও চূড়ান্ত ব্যয়ের কথা তোলেন। তাঁদের বক্তব্য এই যে, বিদ্যালয়-গৃহ ও শিক্ষকদের আবাসকে স্থায়ী করা প্রয়োজন, তা না হলে পর খড় দিয়ে ছাওয়া, মেরামত করা ইত্যাদির ব্যয় হিসাব করলে শেষ পর্যন্ত কাঁচা ঘরের খরচ পাকা বাড়ীর চাইতে ঢের বেশী দাঁড়াবে। এই যুক্তির পিছনে জোর আছে সন্দেহ নেই; কিন্তু বিষয়টা আমাদের আরও গভীরভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন।

টাকা-আনা-পাইএর হিসাবে পাকা বাড়ীর চাইতে কাঁচা বাড়ীর পিছনে ব্যয় ঢের বেশী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু শিক্ষা ব্যাপারে টাকা-আনার হিসাবটাই প্রধান কথা নয়। নিজে পাকা বাড়ীতে থেকে ভাল খড়ের ঘর তৈরীর উপদেশ যদি শিক্ষকমশাই গ্রামবাসীকে দেন তবে তা গ্রামের হৃদয়কে স্পর্শ করবে না; অথচ সমগ্র গ্রামকে ইট-সিমেণ্টের খুপরীতে পরিণত করা, ভাল হক মন্দ হক, সম্ভবপর নয়। সহুরে জিনিসকে ভাল বলে মনে করার একটা প্রবৃত্তি আজ গ্রামে আছে, টাকার দ্বারাই ভাল-মন্দের মান নির্ধারণ আমাদের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। এ অবস্থায় পাকা বাড়ীর আমদানী গ্রামে করলে গ্রামের পরনির্ভরতা অকারণ বেড়ে যাবে এবং গ্রামের ধানচাল সিমেণ্ট-কংক্রিট-রাজমিস্ত্রীর পিছনে অযথা গ্রাম ছেড়ে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা সুরু করবে। সিমেণ্ট-কংক্রিটের আদর্শকে গ্রামের মধ্যে নিয়ে ফেললে পল্লীর আর্থিক ও সামাজিক জীবনে একটা অবাঞ্ছিত আলোড়ন আসবে

বলেই আমার ধারণা। গ্রামের আর্থিক বুনিয়াদ আজ এত দৃঢ় নয় যে, ঘরবাড়ীর জন্য গ্রামের অর্থকে আজ সহরের দিকে চালান দেওয়া চলতে পারে। খড়ের অভাব আজ সত্যই গ্রামে রয়েছে। খড়ের অভাবে আজকাল গ্রামে গরুকে আধপেটা খেয়ে থাকতে হয়। সে ক্ষেত্রে গৃহনির্মাণে খড়ের ব্যবহার কমান প্রয়োজন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে সিমেণ্ট অথবা টিনের উপর গ্রামকে নির্ভরশীল না করে গ্রামে গ্রামে টালি, খাপরা তৈরীর শিল্প স্থাপনা করা প্রয়োজন। এতে ঘরবাড়ীর পিছনে পৌনঃপুনিক ব্যয়ও কমবে, অন্যদিকে গ্রামে শিল্পসৃষ্টি ও ঐশ্বর্যবৃদ্ধিরও সহায়তা হবে।

স্থায়ী পাকা ঘরবাড়ী করার পক্ষে আর একটা যুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে। সেটা এই যে, গ্রামের লোককে উদ্বুদ্ধ করে এক-আধ বার হয়তো ঘরবাড়ী তৈরীর কাজে তাদের সহায়তা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কাঁচা ঘরবাড়ী তৈরী করার ফলে গ্রামের সহায়তা যদি প্রতি বছরই পাওয়ার প্রয়োজন হয় তবে তা পাওয়ার নিশ্চয়তা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ থাকে। আমার তো মনে হয়, এই কারণেই বুনিয়াদী শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত ঘর-বাড়ী কাঁচা হওয়া প্রয়োজন; কারণ বিদ্যালয়ের প্রতি গ্রামের ঔৎসুক্য, আগ্রহ, সক্রিয় সহযোগিতা উত্তরোত্তর বাড়ছে কি না এটাই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। গ্রামের কাছ থেকে যথাসম্ভব সাহায্য একবার আদায় করে পাকা ঘরবাড়ী তৈরী করে বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ যদি নিশ্চিন্ত হয়ে বসেন, গ্রামের ঔৎসুক্য ও সহযোগিতাকে বাঁচিয়ে রাখা তাঁরা যদি আর প্রয়োজনীয় মনে না করেন, তবে বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে আজ যে প্রাচীর

রয়েছে তা একটুও কমবে না। বিদ্যালয়-সংক্রান্ত সমস্ত ঘরবাড়ী এমন হওয়া চাই যা গ্রাম নিজের সামর্থে, নিজের শ্রমেই রক্ষা করতে পারে।

আর একটা দিক থেকেও বর্তমান অবস্থায় স্থায়ী ঘরবাড়ী তৈরী করার পক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পাইনে। কাঁচা ঘরবাড়ীর পরিবর্তন-সাধন সহজসাধ্য, পাকা বাড়ীর বেলায় তা নয়। আজ বুনিয়াদী শিক্ষা যে কোঠায় আছে তাতে এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের জন্য কোন্ শ্রেণীর কি পরিমাপের ঘরবাড়ী সর্বাপেক্ষা উপযোগী তার কোন চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়নি। সে ক্ষেত্রে বিরাট প্রারম্ভিক ব্যয়ে পাকা ঘরবাড়ী তৈরী করার পক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পাইনে। কি বিদ্যালয়, কি শিক্ষকের বাসগৃহ আজ তাই কাঁচা হওয়া বাঞ্ছনীয় বলেই মনে করি। সত্যই যদি কোনদিন মনে হয় পাকা ঘর কাঁচা ঘরের চাইতে উৎকৃষ্টতর এবং যদি তা দেশের সর্বসাধারণের পক্ষে সহজলভ্য করে তোলা যায়, তবে সেদিন হয়তো বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও তার শিক্ষকদের জন্য পাকা বাড়ীর ব্যবস্থা করা চলতে পারে। সমাজের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমাজের পক্ষে সহজসাধ্য আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র সমাজের সামনে তুলে ধরবে, এটাই বুনিয়াদী শিক্ষার একটি মূলকথা। গৃহনির্মাণের বেলাতেও আমরা যেন এ কথাটি বিস্মৃত না হই।

(খ) গৃহ তৈরী যেমন গ্রামেরই উপাদানে করতে হবে তেমনি এই গৃহকে সাজাতেও হবে গ্রামেরই সহজলভ্য উপাদানে। আদর্শ গৃহ গ্রামের উপাদানে তৈরী করা নিশ্চয়ই অসম্ভব নয়। মেঝেকে শুকনো খটখটে রাখা, ঘরে প্রচুর আলোবাতাস চলাচলের ব্যবস্থা

তাতে সহজেই হতে পারে। অথচ সামান্য বাঁশ খড় মাটি প্রভৃতি দিয়েই অসামান্য শিল্পরচনা যে চলতে পারে তা আমরা প্রায় ভুলে যেতে বসেছি। গৃহনির্মাণ-শিল্প একদিন আমাদের দেশে একটা মস্ত বড় শিল্প ছিল। হাতের অনেকখানি নৈপুণ্য, মস্তিষ্কের অনেকখানি ব্যবহার তাতে প্রয়োজন হত। আজ পাকা বাড়ীর দৌলতে যন্ত্রবৎ মিস্ত্রীমজুরের সংখ্যা অনেক বেড়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু শিল্পীর দল নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বসেছে। ঘর তৈরী আর ঘর সাজানতে গ্রামের সামান্য উপাদান যে কতখানি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারে তার প্রচুর নিদর্শন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল দেখিয়েছেন। তবু যে সেই শিক্ষা প্রসারিত না হয়ে সস্তা নকলের মোহ আমাদের পেয়ে বসেছে সেটা আমাদেরই দুর্ভাগ্য। আমরা ভারতের শিল্পকে সঞ্জীবিত করতে চাইছি, শিক্ষার মধ্য দিয়ে সেই রুচিকে জনমনে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছি। আমাদের বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি ও শিক্ষকদের আবাসস্থান তারই নিদর্শন হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষকদের শিক্ষাদান-ব্যবস্থায় যদি আমরা এই শিক্ষাকে যথোচিত স্থান দিতে পারি এবং বুনিয়াদী শিক্ষার ও শিক্ষকের মাধ্যমে যদি আমরা গ্রামে গ্রামে এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি, তবেই দীর্ঘকালের পরাধীনতার ফলে আমাদের দেশে যে রুচিবিকার দিগন্তবিস্তৃত হয়ে উঠেছে তা থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হতে পারে। গ্রামে গ্রামে গৃহসজ্জার নানাবিধ শিল্প অজ্ঞতা ও অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসের ছাইএর নীচে চাপা পড়ে আছে। গ্রামে শিক্ষাকর্মীর একটি প্রধান কাজ হবে সেই লুপ্তপ্রায় শিল্পগুলিকে বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করা। বাঙলার অনেক জায়গায় টেরাকোটার

কাজ আজ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে। আমরা গৃহ নির্মাণের কাজে সেগুলিকে ব্যবহার করতে পারি। সাঁওতালদের মধ্যে নানারকমের মাটি দিয়ে ঘর রাঙাবার কলাকৌশল প্রচলিত আছে। আমরা যদি গ্রামের সামান্য উপকরণে স্বাস্থ্যকর ঘর তৈরী করে তাতে এই সব শিল্পকলাকে ব্যবহার করি, তবে সত্যই গ্রামের সামনে এক সহজসাধ্য আদর্শ উপস্থাপিত করতে পারব।

(গ) গৃহনির্মাণ ও গৃহসজ্জার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাকর্মীকে দৃষ্টি দিতে হবে পরিবেশকে সুন্দর করে তোলার দিকে। গ্রামে মুক্ত আলোবাতাস, স্বচ্ছ জলের অভাব থাকার কথা নয়। সহরের মত কলের ধোঁয়া, বিরাট প্রাসাদের গর্বোদ্ধত চূড়া বাতাসকে আবিল ও আলোকে ব্যাহত করে না। কিন্তু অজ্ঞতার ফলে আমরা গ্রামের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলেছি। প্রথমেই মনে হয় পাইখানার কথা। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় পাইখানা নামক একটি বস্তুর কোন বালাই নেই। সুন্দর সুন্দর নদীর তীরগুলি পাইখানার গন্ধে ভয়াবহ হয়ে থাকে। পাইখানা করে নদী, নালা, পুকুরের জল প্রতিনিয়ত কলুষিত করা হচ্ছে। যে পুকুরের জল পানীয় রূপে ব্যবহার করা হয় সে পুকুরে শৌচ করার মধ্যে যে কোন অপরাধ, কোন সর্বনাশ আছে এ বোধ পর্যন্ত গ্রাম থেকে লুপ্ত হয়েছে। প্রতিদিন দেখছি বয়স্কা বৌ-ঝিরা পর্যন্ত ডোবায় পুকুরে দাঁড়িয়ে মূত্র ত্যাগ করছেন আর সেই সঙ্গেই সেই জল তুলে নিয়ে মুখ ধুচ্ছেন, থালা-বাসন মাজছেন আর সেই থালা-বাসনে স্বামী পুত্রকে সযত্নে খেতে দিচ্ছেন। এ যে কতখানি ভয়াবহ ব্যাপার

—দীর্ঘকালের অভ্যাসে সেই বোধটুকু পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়েছে। তারপর ঝোপঝাড়ে বাড়ীতে আলোবাতাস ঢোকার সকল পথকে রুদ্ধ করে রাখার দুর্বুদ্ধির কথা মনে হয়। বাড়ীগুলির চারদিকে বিধাতার আশীর্বাদকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য ঝোপঝাড়গুলি যেন ঘুষি উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ভিতরে যেমন দিনের বেলাতেও আলো জ্বেলে ঢুকতে হয়, বাড়ীর সমগ্র সীমাটাই তেমনি অন্ধকারের রাজত্ব, দুর্গন্ধের ঘাঁটি। বাঁশের ঝাড়গুলি ঠেকায় বাইরের আলো-বাতাসকে, আর তার পাতাগুলি পচে আমদানী করে রোগ আর দুর্গন্ধ। তারপর যে সব অঞ্চলে মাটির বাড়ী তৈরীর প্রাধান্য সেখানে প্রত্যেক বাড়ীতেই একটি করে ডোবা। সেই ডোবা বাড়ীর যত আবর্জনার ভাণ্ডার। মশা মাছি সেখানে পরমসুখে ডিম পাড়ে আর বংশ বৃদ্ধি করে।

এই সব কিছুতে মিলে গ্রামকে স্বর্গের বদলে নরকে পরিণত করেছে। এতে যে কেবল গ্রামের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়েছে তা নয়, রুচিরও পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটেছে। এরই ফলে পাঁচজনে মিলে একসঙ্গে গল্প করতে করতে পাইখানা করাটা স্বাভাবিক হয়ে গেছে, আবার ঘোমটা টেনে স্নানের ঘাটে শৌচ করাটা অস্বাভাবিক বলে ঠেকে না। পরিবেশকে শ্রীহীন করে রাখাটা যে কেবলমাত্র দৈহিক স্বাস্থ্যকেই পঙ্গু করেছে তা নয়, মানসিক স্বাস্থ্যকেও বিকল করেছে।

পরিবেশকে এই ক্লেদাক্ততা থেকে রক্ষা করা হবে শিক্ষাকর্মীর অন্যতম প্রধান কাজ। আজ মানুষের মলমূত্র গ্রামের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। খোলা মাঠে আমরা মলমূত্র ত্যাগ করতে অভ্যস্ত। ফলে এর সারাংশটুকু সূর্যের তাপে নষ্ট হয়ে যায়, আর এর ভিতরকার

বীজাণুগুলি সহজেই ছড়াবার সুযোগ পায়। গ্রামে মলমূত্র তাই হুকওয়ার্ম, কলেরা প্রভৃতি রোগ ছড়ানর একটি প্রধান মাধ্যম। এই অভিশাপকে যে অতি সহজেই আশীর্বাদে পরিণত করা যায় তা শিক্ষা-কর্মীকে প্রমাণিত করতে হবে। নালা পাইখানা করে তাতে মলমূত্র ত্যাগ করতে হবে এবং এই অভ্যাস গ্রামে চালু করতে হবে। প্রতিবার পাইখানা ব্যবহার করার পর ঠিকভাবে মাটি চাপা দিলে যে দুর্গন্ধ, মশামাছির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে এবং অমূল্য সার সৃষ্টি করা যেতে পারে সেটা কার্যতঃ প্রমাণিত করে দেখাতে হবে। অতি কম খরচেই এইরকম পাইখানা তৈরী করা চলতে পারে। বাঁশ ও খেজুর- বা তাল-পাতা দিয়ে আলাদা বেড়া তৈরী করে পাইখানা ঘেরা চলতে পারে এবং এক জায়গায় নালা কাটার স্থান ভর্তি হয়ে গেলে বেড়াগুলি খুলে নিয়ে নূতন পাইখানা তৈরী করা যায়। বাঁশের চাঁচ কিংবা বাঁশ বুনেও এরকম ঘেরা করা চলতে পারে। গোটা তিনেক বাঁশ আর কিছু তাল বা খেজুর পাতা হলে এরকম পাইখানা তৈরী হয়ে যেতে পারে।

গাছপালার বেলায় আমাদের মনোভাবটা অদ্ভুত। গাছ আমরা রোপণ করি না ; জ্বালানীর অভাবে ওগুলিকে পোড়াতে আমরা অভ্যস্ত। অথচ ঘরের চারদিকে ঝোপঝাড় আমরা সযত্নে পুষে রাখি। বাড়ীর চারদিকে বাঁশঝাড়ের প্রাচীর ভেদ করে অনেক বাড়ীতে সূর্যের কিরণও ভালভাবে প্রবেশ করতে পারে না। যেখানে গাছপালা কম সেখানে আমরা মাটির প্রাচীর তুলতে হলেও আলো-বাতাসের পথ রুদ্ধ করে রাখি। এই সর্বপ্রকার প্রাচীর ভেঙ্গে আলো-বাতাসকে গৃহের অঙ্গনে অবাধে চলাচলের পথ করে দিতে

হবে। পরিবর্তে যেখানে খোলামাঠে গাছের অভাবে মাটি ধুয়ে খোয়াই সৃষ্টি হচ্ছে, আলগা বাঁধনের মাটি জলের তোড়ে সার শুদ্ধ ভেসে চলে যাচ্ছে, সেখানে প্রতি বছর বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক জায়গায় দেখেছি, গ্রামেরই অনুকরণে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাড়ীর চারধারেও উঁচু পাঁচিল তুলে দেওয়া হয়েছে। এতে গ্রামের ত্রুটিটুকুই গ্রহণ করা হবে মাত্র, কোন নূতন আদর্শ স্থাপন করা সম্ভবপর হবে না।

ডোবাগুলিও যাতে ঘরে ঘরে না কেটে একটা জায়গা থেকে মাটি কেটে জলাশয়ের সৃষ্টি করা যায় সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। এই ডোবাগুলি প্রায়ই রাস্তার ধারে কাটা হয় এবং ডোবায় পরিণত করা হয়। এই ডোবাগুলি দুর্গন্ধ ও মশামাছির প্রধান পালনস্থান হয়ে গ্রামের বাতাসকে আবিল করে তোলে। গ্রাম-পঞ্চায়েতের সহায়তায় এগুলি বন্ধ করার কাজে শিক্ষাকর্মীকে বিশেষভাবে উৎসাহী হতে হবে। এরকম ডোবাতে যে সার রাখা হয় তাতে উৎকৃষ্ট সার তৈরী হতে পারে না। সূর্যের আলোতে আর বৃষ্টির জলে ধুয়ে এই সারে সারবস্তু কমই থাকে। এই সার-ডোবার পরিবর্তে কম্পোষ্টের গাদা তৈরী করান কর্মীর একটি সর্বপ্রধান ব্রত হওয়া প্রয়োজন।

(ঘ) এই গৃহ ও পরিবেশের মধ্যে কর্মীকে সুস্থ, সুন্দর ও কর্মময় জীবন যাপন করতে হবে। শিক্ষার অভাবেই যে আমরা নিজ শক্তিতে গ্রামে সুন্দর সুস্থ জীবন যাপন করতে পারছি না তা কর্মীকে নিজের কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত করতে হবে। সুন্দর জীবন যাপনের সকল উপাদানই আমাদের চারপাশে রয়েছে, বুদ্ধি ও

সহযোগিতার অভাবে আমরা সেগুলিকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারছি না। আশপাশের ছড়ান উপাদানকে জীবনের মান উন্নত করার জন্য ব্যবহার করার পথ শিক্ষাকর্মীকে দেখাতে হবে।

সুস্থ জীবনের জন্য পর্যাপ্ত বস্ত্র, পরিমিত আহার ও নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা প্রয়োজন। পর্যাপ্ত বস্ত্র গ্রামেই প্রস্তুত হতে পারে, এবং বিনামূল্যেই প্রস্তুত হতে পারে। ঘরে ঘরে জনপ্রতি দুটো তিনটে করে জটা বা বুড়ী কার্পাসের গাছ করার মত পর্যাপ্ত জমি গ্রামাঞ্চলে প্রত্যেকের বাড়ীতেই রয়েছে। গ্রামের অধিকাংশ লোকের বছরে প্রায় ৮ মাস কোন নিয়মিত কাজ থাকে না। বস্তুতঃ এই নিরবচ্ছিন্ন বেকারত্ব ঘোচানই আমাদের একটি বড় সমস্যা। তাছাড়া গ্রামের মেয়েদের সংসারের কাজ করেও বহু সময় উদ্বৃত্ত থাকে যা ঝগড়া-ঝাঁটি আর পরনিন্দা-পরচর্চা করেই ব্যয়িত হয়। বস্ত্র-উৎপাদনের কাজ গ্রামে সুরু করলে প্রত্যেকেরই বারমাস কাজের সংস্থান হতে পারে, উপরন্তু নূতন কতকগুলি শিল্প গ্রামে সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে। চরকা ও তাঁতের মধ্য দিয়ে ছুতোর, কামার, কুমারের শিল্পগুলি পুনরুজ্জীবিত হতে পারে। বস্ত্রের জন্য গ্রামের সহরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামোর পক্ষে সর্বনাশা। কম সময়ে মিলে প্রচুর কাপড় উৎপাদিত হতে পারে, এটা গ্রামের বস্ত্র-শিল্পে পরনির্ভরতার পক্ষে কোন যুক্তিই নয়। গ্রামের লোকের হাতে সময়ের কোন অপ্রাচুর্য নেই, সেই সময় বাঁচিয়ে সময়কে অন্য কাজে সদ্ব্যবহার করার ব্যবস্থা হওয়ার আগে বস্ত্রের জন্য পরের মুখাপেক্ষী হয়ে শ্রমার্জিত শস্যের পরিবর্তে বস্ত্র ক্রয় করা শরীরের পক্ষে প্রতিনিয়ত শোণিতস্রাবের মতই ক্ষতিকর। বিদ্যালয়

গঠনের আগে গ্রামে কাতাইমণ্ডল গঠনের প্রয়াস করা প্রয়োজন, তা বয়স্কদের নিয়েই হক আর শিশুদের নিয়েই হক। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে সূতা যেন পড়ে না থাকে। কর্মীকে বয়নের ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করতে হবে। অব্যবহৃত সূতা যদি স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে তবে সূতাকাটার আগ্রহের জোয়ারে ভাটার টান আসতে বাধ্য।

খাদ্যের বেলাতেও গ্রামে গিয়েই কর্মীর করণীয় অনেকগুলি কাজ আছে। প্রথম প্রয়োজন অনুন্নত গৃহপালিত জীবজন্তুর উন্নতি-সাধন। গ্রামে দেখি, গৃহস্থের ঘরে হয়তো ২০।২৫টি গাই আছে কিন্তু দুধ হয় ১॥ কি ২ সের। বিদ্যালয়ে খুব কম ছেলেরই দুধ খেয়ে আসবার সৌভাগ্য হয়। এই দুধের অভাবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা গ্রহণ করার মত পুষ্টির অভাব ঘটছে। দুধের অভাবের প্রধান কারণ দুগ্ধপ্রদানকারী জন্তুর অভাব নয়, তাদের যত্নের অভাব। আমরা যেমন নির্বিচারে পুত্রকন্যার জন্ম দিতে অভ্যস্ত—তাদের খেতে পরতে দিতে পারব কিনা, শিক্ষায় দীক্ষায় মানুষ করে তুলতে পারব কিনা সে চিন্তার বালাই নেই—তেমনি আমরা নির্বিচারে যত খুশী পশু পালন করে থাকি ; তাদের খাদ্য, স্বাস্থ্য, যত্নের কথা বিন্দুমাত্র ভাবি না। এই সংখ্যাধিক্য আমাদের সম্পদ না হয়ে বোঝাই হয়ে দাঁড়ায়। রুগ্ন পশু দুধের চেয়ে বেশী রোগই উপহার দেয়। তাছাড়া, তৈরী ফসল নষ্ট করায় এরা যে কতখানি দায়ী তার কোন হিসাবই আমরা করি না। শিক্ষাকর্মীকে উন্নতধরণের গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি পালন করে এ দিকে পথপ্রদর্শন করতে হবে। এ বিষয়েও আমাদের সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে। উন্নতধরণের বিদেশী গরু ছাগল এনে পুষতে গেলে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না।

খারাপ এঁড়ে বাছুর বা পাঁঠাকে প্রজনন-শক্তিহীন করবার ব্যবস্থা করতে হবে এবং স্থানীয় গরু, ছাগল ইত্যাদিকে ক্রমোন্নতির দিকে নিয়ে যেতে হবে। সবসময় কর্মীকে মনে রাখতে হবে যে, কেবলমাত্র বাইরের আমদানী করা ভাল জিনিস দিয়ে একটা অঞ্চলের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। বিশেষ বিচার-বিবেচনার পরই বাইরের জিনিস গ্রামে আমদানী করা প্রয়োজন।

গ্রামের পরিচ্ছন্নতার জন্য শিক্ষাকর্মীকে প্রথমাবধি আন্দোলন করতে হবে। এ বিষয়ে গ্রামকে সচেতন করা সহজ কাজ নয়। ভাল ছবি বা ম্যাজিক লণ্ঠন এ বিষয়ে কর্মীকে প্রচুর সহায়তা করতে পারে। গ্রামে পরিচ্ছন্নতার অভাববোধ জাগ্রত করতে হবে। কর্মী যদি কেবলমাত্র নিজের সাধ্য অনুযায়ী গ্রামকে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করেন, তবে গ্রামের লোক আরও বেশী পরনির্ভরশীল হয়ে উঠবে মাত্র। গ্রামের লোকের সহায়তায়ই যে গ্রামকে সুন্দর করে তোলা যায় এ বোধ গ্রামের লোকের মনে আনতে হবে, এর প্রয়োজনীয়তার প্রতি বিশ্বাস গ্রামের লোকের মনে দৃঢ়মূল করতে হবে। কর্মী এজন্য খুব সামান্য ২।৪ জন বন্ধু নিয়ে সাফাইমণ্ডল গঠন করতে পারেন এবং একটি অঞ্চলকে পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন। পরে যখন বিদ্যালয় সংগঠিত হবে তখন বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের দল এই কাজে প্রচুর সহায়তা করতে পারবে। সমগ্র গ্রাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন বুঝলে গ্রাম-সাফাইয়ের কাজে হাত দেওয়া যাবে, এ ভুল যেন কর্মী কখনও না করেন। ষাট মণ তেল হলে তবে রাধা নাচবেন, এ যদি হয়, তবে রাধার নৃত্যনিপুণতা দেখার সৌভাগ্য কখনই হবে না। অপরিচ্ছন্নতার ফলে গ্রামে কত অসুখ-বিসুখ হয়,

তার ফলে কত মজুরী কামাই হয়, কত টাকা ডাক্তারের হাতে যায় তার একটা মোটামুটি হিসাব কর্মীর পক্ষে রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বিদ্যালয় আরম্ভের আগে, বিদ্যালয়ে কৃষিকাজ শিক্ষা দেবার আগে কর্মীকে নিজের বাগানে বারমাস ফসল ফলাতে হবে। এটুকু না করলে গ্রামের লোক শিক্ষাকর্মীর শিক্ষাদানের যোগ্যতাকেই বিশ্বাস করবেন না। যাঁরা চাষের কাজ পুরুষানুক্রমে করে আসছেন তাঁরা এ কথা বিশ্বাসই করতে চান না যে, বিদ্যালয়ের ছেলেমানুষ মাস্টারের কাছে তাঁদের পুত্রকন্যাদের কৃষিবিষয়ে কিছু শিখবার আছে। কৃষির কাজে যে শিক্ষার প্রয়োজন আছে তা শিক্ষাকর্মীকে প্রমাণিত করতে হবে। কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পশুপালনের কাজেও পথ দেখাতে হবে।

(ঙ) তাছাড়া, বস্ত্র জোগাড় করার জন্য গ্রামের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের পথ দেখান প্রয়োজন। আজকাল গ্রামে প্রধানতঃ ধানটুকুই তৈরী হয়। ঐটিই চাষীদের একমাত্র সম্পদ। যা কিছু তাদের কিনতে হয় তার বদলে চাষীদের দিতে হয় ঐ শ্রমোপার্জিত শস্য। সুতরাং দিনের পর দিন চাষীদের শ্রমের ফসল বেরিয়ে যেতে থাকে গ্রাম থেকে ; পরিবর্তে গ্রামে কিছুই প্রবেশ করে না। গ্রামের যা একান্ত প্রয়োজন অথচ আজ যা গ্রামে তৈরী হয় না কিন্তু হতে পারে তেমন জিনিস গ্রামে তৈরী করে গ্রামের সম্পদ বাড়াবার পথ দেখিয়ে দিতে হবে শিক্ষাকর্মীকে। এভাবে গ্রামে সাবান, কাগজ, গুড়—বিশেষ করে তাল-খেজুরের, কাপড়, কাঠের জিনিস, লোহার সাধারণ যন্ত্রপাতি, বাঁশ, বেত, তালপাতা ইত্যাদির জিনিসপত্র প্রভৃতি তৈরী হতে পারে। এসব জিনিস

গ্রামবাসীকে কিনতেই হয়। গ্রামে এগুলি তৈরী হলে গ্রামের শস্য অযথা এগুলিকে অবলম্বন করে বাইরে চলে যেতে পারে না। গ্রামে তেল, ফল ইত্যাদি তৈরী হলে কেবল যে অর্থের দিক থেকেই গ্রাম লাভবান হবে তা নয়, স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও গ্রামে নবযুগের সৃষ্টি হতে পারে। এর সমস্ত কাজই যে কর্মীকে জানতে হবে তা নয়, সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গ্রামের সম্পর্ক স্থাপন করে যথাযোগ্য লোক-সংগ্রহের ব্যবস্থা শিক্ষাকর্মীকে করতে হবে। প্রথমেই শিক্ষালয় খুলে তাতে এসব শিল্পকাজ প্রচলিত করে তার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে গিয়ে গ্রামের অনাস্থাভাজন ও বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়ার চাইতে গ্রামে প্রথমে একরকম এক বা একাধিক শিল্পের প্রচলন করে তার মধ্যে যে প্রচুর শিক্ষার সুযোগ রয়েছে, ওসব কাজ করতে গেলে যে শিক্ষার প্রয়োজন সে বোধ গ্রামবাসীর মনে আনাই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য দুটি কাজই যে একসঙ্গে চলতে পারে না তা নয়, তবে গ্রামে এই বোধ আনার প্রয়োজনীয়তাকে উপেক্ষা করলে কর্মীর বিদ্যালয়-সংগঠনের প্রচেষ্টা ব্যাহত হতে বাধ্য। কর্মীর নিজেরও এক বা একাধিক শিল্পে অধিকার থাকা প্রয়োজন এবং এসব কাজের মধ্য দিয়ে যে সারা বৎসরের কর্মসংস্থান হতে পারে তা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত করা দরকার।

(চ) সর্বোপরি শিক্ষাকর্মীকে মনে রাখতে হবে যে, বিদ্যালয় গঠন করে তিনি শিশুর জীবনে যে কার্যসূচী প্রতিষ্ঠিত করতে চান তা শিক্ষকের সুবিধা অসুবিধা অনুযায়ী কার্যসূচী নয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয় জীবনকেন্দ্রিক। জীবনে যে কাজ যেভাবে করা সবচেয়ে

বৈজ্ঞানিক, যে কাজ যখন করা সবচেয়ে উপযোগী বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কর্মসূচী তারই নির্দেশক। বুনিয়াদী বিদ্যালয় বিদ্যালয়গৃহের চতুঃসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশুর সমগ্র জীবনকে তার অভিভাবকের সাহায্যে গড়ে তোলাই বুনিয়াদী শিক্ষকের কাজ। তাই ভোর থেকে আরম্ভ করে ঘুমাবার সময় পর্যন্ত সকল কাজের উপযুক্ত সময় নির্দেশ করাই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কার্যসূচীর উদ্দেশ্য। এই কার্যসূচীকে সর্বপ্রথমে নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা করার দীক্ষা নিতে হবে শিক্ষাকর্মীকে এবং এই কর্মসূচী প্রতিপালন করে তাঁর নিজের জীবনে কোন্ উপকার সাধিত হয়েছে তা প্রকাশ পাবে তাঁর নিজেরই জীবন দ্বারা। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যদি ভোরে ওঠার শিক্ষা বা কায়িক শ্রমের শিক্ষা বা সকালে সুতাকাটার শিক্ষা দেওয়া হয়, তবে তা দেওয়া হয় এতে উপকার হবে বলে, জীবন সুন্দর সার্থক ও বিজ্ঞানানুগ হবে বলে। শিক্ষককে নিজের জীবনে এ কাজ করে তার উপকারিতা দেখাতে হবে। শিক্ষার্থী এইরকম কার্যসূচী গ্রহণ করবে দেয়ালে টাঙানো কার্যসূচী মুখস্থ করে নয়, শিক্ষকের দণ্ডভয়ে নয়, শিক্ষককে অনুসরণ করে।

বিদ্যালয়ের সংগঠনের জন্য শিক্ষকের এইটুকু আত্মপ্রস্তুতি প্রয়োজন। এছাড়া তিনি প্রকৃত জীবনকেন্দ্রিক বিদ্যালয় গড়ে তুলতে পারবেন না। এই প্রস্তুতি হলে শিক্ষককে জোর করে শিক্ষাদানের প্রহসন করতে হবে না। শিক্ষক যদি নিজের গৃহ, পরিবেশ ও স্বাস্থ্যকে আদর্শ করে তুলতে পারেন, গ্রামের অন্যান্য লোকের মতই আর্থিক সংস্থান নিয়ে গ্রামের পরিবেশের মধ্যেই উন্নততর এবং কর্মময় জীবন যাপন করতে পারেন, তবে গ্রামবাসীরা

স্বতঃই তাঁর জীবনকে অনুসরণ করতে চাইবে, তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইবে, নিজেদের সন্তানসন্ততিকে তাঁর হাতে সমর্পণ করতে চাইবে। গ্রামকে প্রত্যক্ষ সেবা দিতে পারলে গ্রামকে জয় করা সম্ভব হবে নিশ্চয়ই, নিরানন্দ গ্রামে পরিপূর্ণ জীবন ও আনন্দের স্বাদ আনতে পারলে শিক্ষা গ্রামের সহায়তায়ই পরিপুষ্ট হয়ে উঠতে পারবে। গ্রামের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের ফলে শিক্ষকের হাতে গ্রামবাসীরা যে ছেলেমেয়েদের ছেড়ে দিতে চাইবেন তাদের নিয়েই হবে সত্যিকারের বুনিয়াদী বিত্থালয়ের গোড়াপত্তন। এভাবে বিত্থালয় গড়তে গেলে অত্যন্ত বেশী সময় লাগবে বলে আপত্তি হতে পারে; কিন্তু সময় বাঁচাবার জন্য মেকী কাজ করতে গেলে শেষ পর্যন্ত লাভ কিছুই হবে না। সংখ্যাটাই প্রধান হয়ে উঠেছে বলে বিত্থালয়ের কাজে নানারকম আবিলতা প্রবেশ করেছে। সংখ্যাটা প্রথমে প্রকাণ্ড হওয়াই বড় কথা নয়; বরং বুনিয়াদী বিত্থালয়ের ছাত্র-সংখ্যা প্রথমে কিছু কম হওয়াই ভাল। মূল সুঅভ্যাসগুলি অল্পসংখ্যক বালকবালিকাদের মধ্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করা সহজ, আর প্রথম একদল অভ্যস্ত হয়ে উঠলে পরে যারা এসে যোগ দেবে তাদের শিক্ষা দেওয়া সহজ হবে। সুতরাং শিক্ষকের আত্মপ্রস্তুতিই শিক্ষালয়-গঠনের প্রথম সোপান। এই আত্মপ্রস্তুতির জন্য শিক্ষাকর্মীকে আমরা সহায়তা করি না করি, বিত্থালয় খোলার জন্য বিত্থালয়ের ছাত্র-সংখ্যা দিয়েই আমরা তার সার্থকতার পরিমাপ করি—এটা একান্তই ভ্রান্ত ধারণা।

সংগঠনের দিক থেকে শিক্ষাকর্মীর আত্মপ্রস্তুতির কথা আলোচনা করলাম; এছাড়া শিক্ষাদানের জন্যও শিক্ষাকর্মীর প্রচুর আত্ম-

প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। এরপর আমরা সেবিষয়ে আলোচনা করব।

শিক্ষকতার জন্য বুনিয়াদী শিক্ষাকমার আত্মপ্রস্তুতি ঃ

(১) প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ ঃ

শিক্ষকের কাজ সমগ্র গ্রামকে শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখা ও করা। এ কাজের জন্য যে আত্মপ্রস্তুতির দরকার সে কথা আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষক যদি যথেষ্ট আত্মপ্রস্তুতির কষ্ট স্বীকার না করে হাতুড়ে ডাক্তারের মত কাজে অগ্রসর হন তবে পদে পদে জাতীয় জীবনের সমস্যাকে জটিল করে তোলা কিছুমাত্র আশ্চর্যকর নয়। স্বীকৃত না হলেও এ কথা সত্য যে গ্রাম্যজীবনের উপর গ্রামের শিক্ষকের প্রভাব অনেকখানি এবং সে প্রভাব সু না হলে কু হতে বাধ্য।

ভালভাবে নিজের কর্তব্যপালন করতে হলে শিক্ষকের কেবল শিক্ষাবিজ্ঞান জানলে চলবে না। চিকিৎসকের যেমন চিকিৎসা-বিজ্ঞান মুখস্থ করলেই চলে না, চিকিৎসা করার জন্য প্রত্যেকটি রোগ-লক্ষণ নির্ণয় করতে হয়, তেমনি শিক্ষককেও গ্রামের সকল ব্যাধির কারণগুলি সর্বপ্রথমে খুঁজে বের করতে হবে, ব্যাধির ইতিবৃত্ত জানতে হবে। গ্রামের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই গ্রামের সমস্যার কারণ লুকান আছে। গ্রামের সেবা করতে হলে, জীবনের সমস্যার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হলে, এই প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে ভালভাবে জানতে হবে। এই পরিবেশকে এড়িয়ে গিয়ে কোন কাজই করা সম্ভব নয় ; সুতরাং কেবল ভাল ভাল পরিকল্পনা

রচনা করলেই চলবে না, গ্রামের পরিবেশের মধ্যে কোন্ কোন্ পরিকল্পনাকে কতখানি এবং কিভাবে রূপ দিতে হবে সেইটিই স্থির করতে হবে।

গ্রামের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য নিখুঁত পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা প্রয়োজন। শিক্ষাকর্মীকে নিম্নলিখিত খবরগুলি অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে ঃ

(ক) ভূমি ও ভূমিসমস্যা ঃ মোট জমির পরিমাণ ; আবাদী, আবাদযোগ্য, অনাবাদী ও আবাদের অযোগ্য ভূমির পরিমাণ ; জঙ্গল ও চারণভূমি।

জমির মালিকানা—জমিদার, খাজনা, বর্গাচাষীর সংখ্যা ও জমির পরিমাণ, বর্গাচাষ সম্পর্কিত প্রথা ; ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা, তাদের অবস্থা ও মজুরী।

জমির অবস্থা, কি কি শ্রেণীর মাটি আছে, কি কি চাষ হয়,—কৃষিজাত উৎপন্নদ্রব্য, কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানী ও আমদানী।

(খ) জলের উৎস ঃ পানীয় জল, স্নান ও অন্যান্য কাজের জল, সেচের জল ; জলের অপচয় ও তা দূর করার ব্যবস্থা।

(গ) আবহাওয়া ও বৃষ্টিপাত।

(ঘ) স্বাস্থ্য ঃ গ্রামের পরিচ্ছন্নতা, জলনিকাশের ব্যবস্থা, সাধারণ রোগ প্রতিষেধ ও প্রতিকার ব্যবস্থা, নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও চিকিৎসক।

(ঙ) পশুসম্পদ ঃ গ্রামের বিভিন্ন প্রকারের গৃহপালিত পশুর সংখ্যা, তাদের স্বাস্থ্য ও বাসের ব্যবস্থা, সার সঞ্চয় ও ব্যবহার, পশুখাদ্য, চারণভূমি।

(চ) বনসম্পদ ঃ গ্রামের গাছপালা। ফলের গাছ, জ্বালানীর গাছ, লাঙ্গল ও গৃহকাজের উপযোগী গাছ; বন আছে কি না; ভূমিক্ষয়—বৃক্ষরোপণ ও কর্তন।

(ছ) কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী ঃ উপকারী ও অনিষ্টকারী।

(জ) শিল্প ঃ গ্রামে কি কি শিল্প আছে, কোন শিল্প নষ্ট হয়ে গেছে কি, নষ্ট হলে তার কারণ, সেইসব শিল্পীরা বর্তমানে কি করেন, কি কি শিল্পের উপযোগী কাঁচামাল গ্রামে আছে, সমবায়ের ভিত্তিতে কোন্ কোন্ শিল্প গ্রামে সংগঠিত করা যেতে পারে।

(ঝ) শিক্ষা ঃ গ্রামে কতদূর পর্যন্ত পড়াশোনা করবার ব্যবস্থা আছে, কোন্ কোন্ গ্রাম থেকে ছাত্রেরা পড়াশোনার জন্য কর্মীর গ্রামে আসে, কর্মীর গ্রামের ও যে যে গ্রাম থেকে ছাত্রেরা পড়াশোনার জন্য কর্মীর গ্রামে আসে সেই সকল গ্রামে ৬-১১ ও ১১-১৪ বৎসরের কত বালক বালিকা আছে? অন্যেরা পড়াশোনা করতে আসে না কেন? নিকটবর্তী কোন্ কোন্ গ্রামে কোন্ মান পর্যন্ত বিদ্যালয় আছে? সেসকল গ্রামের দূরত্ব কত?

শিক্ষার প্রতি বয়স্কদের মনোভাব কি? বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষার হার, বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা।

৩-৬ বৎসরের বালক বালিকার সংখ্যা, তাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।

(ঞ) আর্থিক সংস্থান ঃ গ্রামের বর্ধিষ্ণু, সচ্ছল ও অভাব-গ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা; জনপ্রতি গড় আয়, ঋণ—ঋণের উৎস ও সাধারণতঃ কিভাবে তা শোধ করতে হয়।

(ট) গ্রাম-পঞ্চায়েৎ ও গ্রামের সমাজ-জীবন।

গ্রাম সম্পর্কে এই পরিসংখ্যান সংগ্রহ করার জন্য গ্রামে গ্রামের প্রত্যেক পরিবার সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে গ্রামের এই সামুদায়িক তথ্য সঙ্কলন করতে হবে।

প্রত্যেক পরিবার সম্পর্কে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি সংগ্রহ করা দরকার :

(১) পরিবারের কর্তার নাম, বয়স, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা—প্রধান অপ্রধান, বৎসরে কয়মাস কোন কাজ থাকে না।

(২) জমির পরিমাণ, লাঙ্গল ও বলদ সংখ্যা, গৃহপালিত পশুর নাম ও সংখ্যা।

(৩) নিজ হাতে চাষ করা জমির পরিমাণ, নিযুক্ত মজুরের মোটামুটি সংখ্যা, বর্গা দেওয়া জমির পরিমাণ, বর্গা নেওয়া জমির পরিমাণ, এক-ফসলী ও দু-ফসলী জমি, কি কি চাষ করা হয়, চাষের খরচ, সেচ ব্যবস্থা, বিভিন্ন চাষের আয় ব্যয়।

(৪) আর্থিক সংস্থান : আয়, আয়ের উৎস, ব্যয়, ঋণ।

(৫) ঘরবাড়ী : কিসের ঘর, গৃহসংখ্যা, গৃহের অবস্থা, পশু-শালা ও তাহার অবস্থা।

(৬) পরিবারের লোকসংখ্যা : প্রত্যেকের নাম, বয়স, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকার উপায়, বৎসরে কয় মাস কাজ করেন, অন্য সময় কি করেন, পরিবারের কর্তার সঙ্গে সম্পর্ক।

এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে কর্মী গ্রামের একটি নিখুঁত চিত্র পেতে পারবেন। এই থেকে গ্রামের কি প্রয়োজন, কোন্ বিষয়ে সেবা সর্বাগ্রে দরকার, তা নিশ্চিতভাবে বোঝা যাবে। এর উপর ভিত্তি করে কাজ করলে কর্মী সহজেই গ্রামের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে

উঠতে পারবেন এবং সহজেই গ্রামের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করতে পারবেন।

অন্যদিকে এই সংবাদগুলিই হবে বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিচিতির উপাদান। এই তথ্যগুলি কর্মীকে শিশুদের অবস্থার সঙ্গে সম্যকরূপে পরিচিত হতে সহায়তা করবে এবং তারই ফলে শিশুর সঙ্গে তাঁর ব্যবহার সহজ ও ত্রুটিহীন হবে।

এসকল তথ্য একদিনে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। ঘরের খবর প্রারম্ভেই জেরা করে বের করতে গেলে গ্রামবাসীর সহযোগিতা কর্মী মোটেই পাবেন না। বিভিন্ন পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে মিশতে একটু একটু করে দীর্ঘ সময়ে এসকল সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে। এসকল সংবাদ যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করার আগেই বিদ্যালয় খুলে বসলে কর্মীর পক্ষে পদে পদেই ভুল করার সম্ভাবনা থাকে।

২। **শিক্ষোপকরণ নির্মাণ ও সংগ্রহ:** গ্রামে গিয়েই বিদ্যালয় সুরু না করার আর একটি বিশেষ জরুরী কারণ আছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাই, বিদ্যালয়-গৃহ রয়েছে, শিক্ষক রয়েছেন, ছাত্র-সংখ্যাও কম নয়, কিন্তু শিক্ষাদানের কোন উপকরণ নেই। ফলে হয় বিনা কাজে ছাত্ররা উসখুস করে, নয় একঘেয়ে তকলী ঘুরিয়ে আর মাটি কুপিয়ে বিরক্ত হয়ে ওঠে, নয়তো শিক্ষক নিরুপায় হয়ে পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমস্যার আশু মীমাংসা করার চেষ্টা করেন। বুনিয়াদী বিদ্যালয় যেমন কেবলমাত্র লেখাপড়ার মাধ্যমে বিদ্যা অর্জনের স্থান নয়, তেমনি বুনিয়াদী বিদ্যালয় কেবলমাত্র কতগুলি কাজের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের স্থান নয়।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশু কাজ করে জীবনের সমস্যাগুলির বুদ্ধিযুক্ত সমাধানের পথ আবিষ্কার করার জন্য। কাজের সঙ্গে তার পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। এ বিকাশ সম্ভব নয় যদি শিক্ষার যথাযোগ্য উপকরণ তার হাতের কাছে না থাকে। সাধারণ শিক্ষায় যেমন শিক্ষার্থী ক্রমশঃ শরীর মনে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, তেমনি বুনিয়াদী শিক্ষাতেও শিক্ষার্থী অন্ধ শ্রমিকে পরিণত হতে পারে সেই আশঙ্কা রয়েছে। এজন্য শিক্ষাকর্মীকে বিদ্যালয় সুরু করার আগে বিদ্যালয়কে শিক্ষাদানের যোগ্য মাধ্যমরূপে সাজিয়ে নিতে হবে। এজন্য যে দামী উপকরণ চাই তা নয়। বস্তুতঃ মণ্টেসরীরীতির সঙ্গে এখানেই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রধান তফাত। স্থানীয় অনায়াসলব্ধ উপাদান দিয়েই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষোপকরণ তৈরী করা যেতে পারে।

কাজ আরম্ভ করার আগে শিক্ষাকর্মীকে অন্ততঃ নিম্নলিখিত উপকরণগুলি তৈরী অথবা সংগ্রহ করে নিতে হবে :

(১) পরিচ্ছন্নতা বিধানের যন্ত্রপাতি : ঝুড়ি, ঝাড়ু, কোদাল, খুরপী, শৌচাগারের ব্যবস্থা, থুথু ফেলার জায়গা, ময়লা ফেলার জায়গা।

(২) স্বাস্থ্য সম্পর্কিত দ্রব্যাদি : একটি থার্মোমিটার, বেডপ্যান, ইউরিন্যাল, আইসব্যাগ, গরম জলের বোতল, মাপবার ফিতা ও ওজনের যন্ত্র ; সাধারণ কিছু ঔষধপত্র, যথা—কিছু কুইনাইন, টিন্‌চার আইডিন, কিছু তুলা, বোরিক এ্যাসিড, সোডি-বাই-কার্ব, সালফা-ডিয়াজিন, সালফাগুয়ানডিন, কিছু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, কিছু ঔষধের গাছ লাগান, যথা—তুলসী, বনচাঁড়াল, গাঁদা, পূনর্ণবা, হিমসাগর, বাসক, আদা, থুলকুড়ি, হিঞ্চা ইত্যাদি।

(৩) শিল্পকাজের, অন্ততঃ সূতাকাটা ও বাগানের কাজের, জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি—সূতাকাটার জন্য তক্‌লী ছাড়া অন্যান্য যন্ত্রপাতি বাঁশ দিয়ে গ্রামেই তৈরী করে নেওয়া চলবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের তক্‌লী ও দপ্তী নিজে কিনে নেবে।

শিক্ষামূলক শিল্পকাজের জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর আলাদা এক এক প্রস্থ যন্ত্রপাতি থাকা দরকার, কারণ শিক্ষার্থী কিভাবে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ও রক্ষা করে—এটাই শিল্প-শিক্ষার একটা মস্ত বড় পরীক্ষা।

(৪) বিদ্যালয়-গৃহকে শিশুদের মনোরঞ্জক করে তোলার জন্য তাকে ফ্রেস্কো, ছবি, আলপনা ইত্যাদি দিয়ে সাজাতে হবে। এসব আঁকার জন্য সাধারণ কুমারের রং বা রঙীন স্থানীয় মাটি ব্যবহার করতে হবে।

(৫) নিম্নলিখিত বোর্ডগুলি তৈরী করে নিতে হবে :

(ক) বিজ্ঞপ্তি বোর্ড : এই বোর্ডে বিদ্যালয় সংক্রান্ত সকল খবর টাঙিয়ে দেওয়া হবে।

(খ) কার্যসূচী বোর্ড : বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কার্যসূচী পরিবর্তনশীল, কারণ কাজের প্রয়োজনে প্রায়ই সময়সূচী পরিবর্তন করতে হবে। সময়সূচী সংক্রান্ত সকল পরিবর্তন এই বোর্ডে জানিয়ে দেওয়া হবে।

(গ) সাপ্তাহিক কার্যবিভাগের বোর্ড : প্রতি সপ্তাহে বিদ্যার্থীরা তাদের সাধারণ সভায় বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব ভাগ করে নেবে। কে কোন্ কাজের ভার নিয়েছে তা এই বোর্ডে জানিয়ে দেওয়া হবে।

(ঘ) প্রার্থনার বোর্ড: প্রার্থনার উপযোগী এক একটি গান শেখা হয়ে গেলেই প্রার্থনার গান পাল্‌টে দেওয়া হবে। প্রার্থনায় কি কি করা হবে তা এই প্রার্থনা-বোর্ডে জানিয়ে দেওয়া হবে। এটি অনেকটা ক্যালেণ্ডারের মত করে তৈরী করতে হবে। উপরে থাকবে একটি যথাযোগ্য ছবির জায়গা, নীচে প্রার্থনার গানগুলি পর পর এঁটে দেওয়া হবে।

(ঙ) দিনপঞ্জী ও আবহাওয়ার প্রদীপন: নীচু শ্রেণীর জন্য এগুলি এমন হওয়া চাই যে, মাস, তারিখ, বার ও আবহাওয়াসূচক বিভিন্ন কথাগুলি আলাদা টুকরো কাগজে আঁটা থাকবে। সেগুলি প্রয়োজন মত দিনপঞ্জী ও আবহাওয়ার বোর্ডে বিদ্যার্থীরা এঁটে দেবে। উঁচু শ্রেণীতে অবশ্য ছেলেরা নিজেদের দিনপঞ্জী ও আবহাওয়ার প্রদীপন নিজেরাই তৈরী করবে, সেগুলিতে প্রতিদিন আলাদা কাগজের টুকরো আঁটবার প্রয়োজন হবে না।

(চ) পতাকার পরিচয় ও পতাকা উত্তোলন অবতরণ সম্পর্কিত নিয়মাবলী।

এরকম আরও অনেক বোর্ড তৈরী করা চলতে পারে তবে এ বোর্ডগুলি প্রথম কাজ আরম্ভ করার জন্যই প্রয়োজনে লাগবে। তাছাড়া, প্রত্যেক সরঞ্জাম নির্দিষ্ট স্থানে রাখবার ব্যবস্থা করা চাই এবং কোথায় রাখা হবে তা সরঞ্জামের নাম আঁটা লেবেল দিয়ে নির্দেশ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন সরঞ্জামের নাম ও সংখ্যা আঁটা একটা সরঞ্জাম তালিকা প্রত্যেক শ্রেণীতে থাকা দরকার।

(৬) কতকগুলি খাতা বাঁধাই করে তা নিম্নলিখিতভাবে ব্যবহার করতে হবে:

(ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সংগৃহীত পাতা ও ফুলের খাতা।

(খ) দেশনায়কের প্রতিকৃতি ও জীবনীর খাতা।

(গ) জগতের ধর্মগুরুদের প্রতিকৃতি, জীবনী ও উপদেশের খাতা।

(ঘ) শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকদের প্রতিকৃতি, জীবনী ও কাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের খাতা।

(চ) জাতীয় আন্দোলন ও জাতীয় পতাকার ক্রম-বিকাশের পরিচয়ের খাতা।

(ছ) সাম্প্রতিক ঘটনা আবিষ্কারের সচিত্র বিবরণ সংগ্রহের খাতা।

(৭) একটি সংগ্রহাগার সংগঠন: তাতে স্থানীয় শস্যাদির নমুনা, স্থানীয় যন্ত্রপাতি ও শিল্পদ্রব্যের নমুনা প্রথমাবধিই যোগাড় করে রাখা দরকার। এই সংগ্রহাগার ক্রমশঃ বিবিধ সংগৃহীত দ্রব্যে পুষ্ট হয়ে উঠবে এবং শিক্ষালাভের একটি অত্যাবশ্যক কেন্দ্র হবে। প্রত্যেক সংগৃহীত দ্রব্যের সঙ্গে সংগ্রহের নাম, সংগ্রহের স্থান ও তারিখ এবং সংগৃহীত দ্রব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকবে।

(৮) অত্যাবশ্যক পুস্তকের একটি ছোট গ্রন্থাগার।

(৯) কয়েকটি খেলার সরঞ্জাম: সাধারণতঃ শুধুহাতে খেলা, ব্যায়াম ও লোকনৃত্যের দিকেই ঝোঁক দেওয়া উচিত হবে। তবে দোল্‌না, লাফাবার দড়ি, কাঠিনাচের কাঠি ইত্যাদির মত কয়েকটি স্বল্পব্যয়সাধ্য খেলার সরঞ্জামও থাকা দরকার।

(১০) জমি মাপবার ফিতা, কম্পাস, আঁকবার ও রঙ করার সরঞ্জাম, সাদা ও রঙীন চক, মানচিত্র ও ভূগোলক।

এ সব উপাদান তৈরী ও সংগ্রহ হয়ে গেলে বিদ্যালয়, গৃহ আপনা আপনি শিশুদের আনাগোনা ও কৌতূহল চরিতার্থ করার একটি তীর্থ হয়ে উঠবে। তখন কাজ আরম্ভ করা সহজ হবে এবং শিশুও প্রথম থেকেই দেহ ও মনের প্রচুর খোরাক পেতে পারবে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পরিচালনব্যবস্থা ও স্থাননির্বাচন

বুনিয়াদী শিক্ষাকে স্বাধীন ভারতের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বলে গ্রহণ করা হয়েছে। এই শিক্ষাব্যবস্থা যে কেবলমাত্র ভিন্ন শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাদানপদ্ধতিরই উপর প্রতিষ্ঠিত তা নয়; এই শিক্ষাব্যবস্থা আজকালকার চালু সমাজ ও অর্থনীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সমাজ ও অর্থনীতির প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী। এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকাকে বাদ দিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ করার অর্থ কেবলমাত্র ভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতিকে গ্রহণ করাই নয়, নূতন সমাজব্যবস্থা ও অর্থনীতিকেও গ্রহণ করা। অন্ততঃ গান্ধীজী-পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা বলতে এই বোঝায়। সামাজিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ অনুযায়ী পরিবর্তন সাধন করতে হলে নূতন আদর্শের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন; এজন্য বুনিয়াদী শিক্ষার সংগঠন কিভাবে হওয়া উচিত তা গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার।

সগেঠনের এই একান্ত জরুরী দিকটার প্রতি এযাবৎ যথেষ্ট

মনোযোগ দেওয়া হয়নি। সাধারণ শিক্ষার কাঠামোটা আগাগোড়া বজায় রেখে এখানে সেখানে কতকগুলি বুনিয়াদী বিদ্যালয় গুঁজে দেওয়া হয়েছে মাত্র। এর ফল ভাল হতে পারে না আর হয়ওনি।

সাধারণতঃ কোন বেসরকারী কর্মী যদি কোন জায়গায় খানিকটা স্থান সংগ্রহ করতে পারেন এবং খানিকটা আর্থিক সহায়তা ও গ্রামবাসীর সহানুভূতি পান তবে সেইখানেই কাজ আরম্ভ করে থাকেন। এর ফল পরিণামে প্রায়ই শুভ হয় না। গ্রামে যদি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যা বেশী থাকে তবে তো অবিলম্বেই বিপদের সূত্রপাত হয়। তাঁরা পাশাপাশি অন্য কোন বিদ্যালয়ে ছেলে পাঠাতে সুরু করেন অথবা বাড়ীতেই পড়ার ব্যবস্থা করেন। যাঁরা কাজ করে জীবিকা অর্জন করার চাইতে সহরের ঘুপচি গলিতে স্বাস্থ্যের মুণ্ডপাত করে দুবেলা নাকে মুখে দুটি ভাত গুঁজে কলম পিষে পরের দাসত্ব করাকে শ্রেয়ঃ ও অধিকতর সম্মানজনক বলে মনে করেন তাঁরা বুনিয়াদী শিক্ষাকে সহজে ভাল চোখে দেখতে পারেন না। বর্তমান পরিস্থিতিতে দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষাকর্মীকে পোষণ করাও গ্রামবাসীরা কর্তব্য বলে বোধ করেন না। শিক্ষাকর দেবার পরও আবার গ্রামে শিক্ষাব্যবস্থার জন্য খরচ করতে তাঁরা নারাজ; কর্মী যখন একা কাজ আরম্ভ করেন তখন গ্রামের সহানুভূতি খানিকটা পাওয়া গেলেও কর্মীসংখ্যা অপরিহার্যভাবে বাড়লেই সহায়তা আর পাওয়া যায় না। গ্রামের লোক বহু কর্মীর দায়িত্ব একেবারেই নিতে চান না, আর বর্তমান অর্থনৈতিক সংগঠনের ফলে পারেনও না। অথচ একজন কর্মীর পক্ষে একটা পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয় গড়ে তোলা কখনই সম্ভব নয়।

আবার বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যাও এমন হয় না বা এমন উপকরণ সংগ্রহ করাও সম্ভব হয় না যাতে বিদ্যালয় আর্থিক স্বাবলম্বনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে পারে। এজন্য বেসরকারী বুনিয়াদী বিদ্যালয় ক্রমশঃ অবলুপ্ত হতে বসেছে। বুনিয়াদী শিক্ষাকে সার্থক করতে হলে যে মূলধন দরকার তা নিখিল ভারতীয় কোন কোন সংস্থার হাতে থাকলেও সাধারণ গ্রাম-কর্মীর হাতে নেই। তাই এ সকল কর্মীকে সহায়তা দিলে বুনিয়াদী শিক্ষার যে পরীক্ষা হতে পারত তা হয়ে উঠছে না।

আবার সরকারী বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিও ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে উঠছে। যে সব গ্রাম ৬ বিঘা জমি ও ৪ হাজার টাকা দিতে পারে সে সব গ্রামে সরকারী সহায়তায় বুনিয়াদী বিদ্যালয় গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ফলে সমগ্র প্রদেশে এখানে ওখানে বুনিয়াদী বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। বহু ক্ষেত্রেই দেখছি এ সব বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে যাতায়াতের দিক দিয়ে দুর্গম স্থানে। প্রথম পরীক্ষার পক্ষে এটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। এর মধ্যে আবার স্কুলবোর্ডের রাজনীতি আছে। সদস্যদের নির্বাচনকেন্দ্রগুলিতে সরকারী টাকার একটা বড় অঙ্ক নিয়ে যেতে পারলে প্রভাব বাড়ার সম্ভাবনা। সুতরাং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের স্থাননির্বাচন নিয়ে সেখানে কাড়াকাড়ি বাধে। কোন কোন সম্পন্ন গ্রামের লোকও ৪ হাজার টাকা দিয়ে সরকারী ২৮ হাজার টাকার সম্পত্তি হস্তগত করে গ্রাম্য দলাদলি কায়েম করতে তৎপর। ফলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের স্থাননির্বাচনে শিক্ষাবিষয়ক বিবেচনার চাইতে অন্য বিবেচনাই দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রাধান্য লাভ করে।

এই সব বিদ্যালয়ে যাঁরা শিক্ষা দিতে যাচ্ছেন তাঁরা কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে অনভ্যস্ত। শিক্ষণ-শিক্ষালয়ে একবছরে তাঁরা যেটুকু শিক্ষা লাভ করে আসেন তাতে তাঁরা প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করার শক্তি অর্জন করে প্রায় কেউই আসেন না। এক বছরে তাঁরা শিক্ষার উপকরণও এতখানি সংগ্রহ করতে পারেন না যাতে প্রারম্ভে সহায়তা, পরিদর্শন ও উপদেশ ছাড়া এঁরা সার্থক শিক্ষাদানের পথে এগিয়ে যেতে পারেন। বিচ্ছিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্য এঁদের ছেড়ে দেওয়ার ফলে এঁরা কাজের মাধ্যমে শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের প্রতিকূল মনোভাবের জন্য প্রথমেই আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তার অভাবে পথ হারিয়ে এমন গোঁজামিলের চেষ্টা করেন যাতে বুনিয়াদী শিক্ষা কথাটা একটা হাস্যাস্পদ ব্যাপার হয়ে ওঠে।

অপর পক্ষে বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করছেন মামুলী শিক্ষা-পদ্ধতিতে অভ্যস্ত অবর বিদ্যালয়-পরিদর্শকরা। তাঁদের পক্ষে বুনিয়াদী বিদ্যালয় পরিদর্শন করে শিক্ষকদের সহায়তা করা সম্ভব নয়। এঁরা শিশু এবং কাজের মধ্য দিয়ে তার গঠনের চাইতে বিদ্যালয়ের খাতাপত্রই বেশী বোঝেন, ফলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষককে সাহায্য করার চাইতে অভ্যস্ত রীতিতে খুঁত ধরাই তাঁদের পক্ষে সহজ হয়। যেখানে বুনিয়াদী শিক্ষণ-শিক্ষা প্রাপ্ত অবর বিদ্যালয়-পরিদর্শক আছেন সে সব জায়গায় তাঁদেরও শিক্ষা অত্যন্ত কাঁচা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহুদিনের অভ্যস্ত শিক্ষাধারার পরিবর্তে তাঁরা নূতন শিক্ষাধারা ও ব্যবস্থায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি।

তদুপরি সর্বত্র তাঁদের হাতে সাধারণ ও বুনিয়াদী উভয়প্রকার বিদ্যালয় পরিদর্শনের ভার রয়েছে। ফলে বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি ও তার প্রয়োগ নিয়ে চিন্তা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োগ করার সুযোগ তাঁদের যথেষ্ট হয় না। তাছাড়া তাঁদের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ের সংখ্যা এত অধিক যে তাঁদের পক্ষে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রতি যথেষ্ট নজর দেওয়া এবং এই প্রাথমিক অবস্থায় অনভিজ্ঞ শিক্ষকদের যথেষ্ট সহায়তা করা একেবারেই সম্ভব নয়। সর্বোপরি রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থার যন্ত্রটা মামুলী ধরণেরই রয়েছে, বুনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োজনে তাকে উপযোগী করে নেওয়া হয়নি। ফলে যন্ত্রটার আগাগোড়া এত উঁচু নীচু সিঁড়ি রয়েছে, তাতে শাসনের রক্তচক্ষু এত স্পষ্ট যে সহযোগের যে আবহাওয়াটা নূতন শিক্ষাব্যবস্থাকে সার্থক করার জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তার একান্ত অভাব ঘটেছে। বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি যাঁরা নির্ধারণ করেছেন এমন কি শিক্ষণ শিক্ষার ক্ষেত্রে যাঁরা একান্ত জরুরী স্থান অধিকার করে আছেন তাঁদের সঙ্গে পর্যন্ত অনেকস্থলে বুনিয়াদী শিক্ষার কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই। এক যুগেরও বেশী যে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষা চলেছে তাকে কার্যকরী করার ভার যাঁরা নেবেন তাঁদের কেবল শিক্ষা বিষয়ে পণ্ডিত হলেই চলবে না এই পরীক্ষার সঙ্গেও তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগ ও সহানুভূতি থাকা দরকার। গান্ধীজীর মতে বুনিয়াদী শিক্ষা হচ্ছে একটা নীরব সমাজ-বিপ্লবের অগ্রদূত। (The spearhead of a silent social revolution)। গান্ধীজীর শিক্ষাপরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হলে এই সমাজ-পরিকল্পনায় বিশ্বাস অপরিহার্য। এই বিশ্বাসের অভাবের ফলেই

আমাদের বুনিয়াদী শিক্ষা-সংগঠনে ত্রুটি থেকে যাচ্ছে ; বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য বিপুল অর্থব্যয় এই কারণেই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা না করে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি জনসাধারণকে বিতৃষ্ণ করে তুলেছে।

তাছাড়া দেশের সামনে আজ যে সমস্যা তা হচ্ছে সমগ্র দেশের শিক্ষাব্যবস্থার রূপান্তর ঘটাবার সমস্যা। একটা হুটো ভাল বুনিয়াদী বিদ্যালয় সংগঠন করে সে সমস্যার সমাধান হবার নয়। ভাল বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দু-একটি ভাল বুনিয়াদী বিদ্যালয় গড়ে উঠলেও জনসাধারণের বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি অবিশ্বাসের ভাবটা দূর করা অনেকটা সহজ হবে ; কিন্তু আমাদের সামনে সত্যকার সমস্যাটা আরও ব্যাপক। দু-চারজন ভাল শিক্ষক সংগ্রহ করে সরকারী হ'ক বেসরকারী হ'ক ভাল বিদ্যালয় গড়ে তুললে সকলেরই মনে হবে উন্নতি শিক্ষকের জন্য হয়েছে শিক্ষাব্যবস্থার জন্য হয়নি। ভাল শিক্ষক যে পদ্ধতিরও উর্ধ্বে উঠে শিক্ষাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেন সে কথা অনস্বীকার্য্য। সুতরাং আমাদের প্রমাণ করতে হবে সাধারণতঃ যেরকম শিক্ষক পাবার সম্ভাবনা আছে, তাঁদের নিয়েই বুনিয়াদী শিক্ষার যোগ্য সংগঠন গড়ে তুললে শিক্ষার রূপান্তর ঘটান সম্ভব।

বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে আর একটা প্রশ্ন উঠেছে, সেটা হচ্ছে ব্যয়ের প্রশ্ন। শিক্ষাজগতের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে কিছুদিন আগে একখানা পত্র পেয়েছি। তাতে তিনি লিখেছেন : "বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যয় হিসাবে কোথাও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় নাই। ভবিষ্যতে যে হইবে সে সম্বন্ধে খুবই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। অথচ

বুনিয়াদী শিক্ষালয় স্থাপন সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চাইতে অধিকতর ব্যয়বহুল। তাই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।...গান্ধীজী যে কারণে এই শিক্ষাপদ্ধতিকে আমাদের মত এই দরিদ্র দেশের পক্ষে উপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন দেখিতেছি ঠিক সেই কারণেই উহা এখন ইহার প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" একটি সরকারী বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে প্রারম্ভিক ব্যয় হচ্ছে ৬ বিঘা জমি ও ৩২, ০০০৲ টাকা ; তাছাড়া বর্ধিত হারে শিক্ষকদের ভাতা তো রয়েছেই। এই ব্যয়ে বেশী বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলা বেসরকারী প্রচেষ্টায় তো দূরের কথা সরকারী প্রচেষ্টায়ও যে সহজে সম্ভব নয় তা অনায়াসেই বোঝা যায়। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪, ৭৬৭ ; আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হ'লে এই সংখ্যা আরও বাড়বে সন্দেহ নেই ; গান্ধীজীর মতে ব্যবস্থা হ'লে তো প্রত্যেক গ্রামের জন্য একটি করে বিদ্যালয় প্রয়োজন। আমরা যদি প্রয়োজনীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যাকে ১৫, ০০০-ও ধরি এবং বিদ্যালয় পিছু ঘরবাড়ী তৈয়ারির খরচ ত্রিশ হাজার টাকাও ধরি, তবু শুধু এই প্রারম্ভিক ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে সাড়ে চার কোটি টাকা। তা ছাড়া শিক্ষণ-শিক্ষা, শিক্ষার্থী শিক্ষকদের বৃত্তি, শিক্ষকদের ভাতা, পরিদর্শন ইত্যাদির ব্যয় তো আছেই। এত অর্থব্যয়ে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতিষ্ঠার কল্পনা কি সত্যই কল্পনাবিলাস নয়?

বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রচেষ্টাকে সার্থক করতে গেলে আমাদের উপরি-উক্ত সমস্যাগুলির সমাধান করতে হবে। এই সমস্যাগুলি হচ্ছে ঃ (ক) সংগঠন, (খ) স্থাননির্বাচন, (গ) শিক্ষক নির্বাচন, (ঘ) শিক্ষণ-

শিক্ষা, (ঙ) পরিদর্শক, ও (চ) ব্যয়ের সমস্যা। এ সব সমস্যার সমাধান সম্ভব না হলে বুনিয়াদী শিক্ষার অপমৃত্যু অপরিহার্য। আমরা একটি একটি করে সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করব।

সংগঠন—বেসরকারীভাবে বুনিয়াদী শিক্ষার সংগঠন গড়ে তুলতে হ'লে কিভাবে তা সার্থক হওয়া সম্ভব 'বুনিয়াদী শিক্ষা ও স্বাবলম্বন' শীর্ষক প্রবন্ধে সে বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। আমার ধারণা শুধুমাত্র গোষ্ঠী-স্বাবলম্বনের দ্বারাই বেসরকারীভাবে বুনিয়াদী শিক্ষার সংগঠন গড়ে তোলা যেতে পারে।

এখানে সেখানে বুনিয়াদী বিদ্যালয় গড়ে তোলা এবং জনসাধারণের মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা ও সাহানুভূতি জাগ্রত করা বেসরকারী প্রচেষ্টার সাধ্যায়ত্ত হলেও সমগ্র দেশের শিক্ষাব্যবস্থার রূপান্তরসাধন বেসরকারী প্রচেষ্টার সাধ্যায়ত্ত নয়। সেজন্য সরকারী প্রচেষ্টা প্রয়োজন। কোন গণতান্ত্রিক দেশের সরকারের পক্ষে জাতীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে দলীয় আদর্শকে জোর করে জাতির উপর চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং যদি সরকার মনে করেন যে বুনিয়াদী শিক্ষার মত বিপ্লবী শিক্ষাদর্শ গ্রহণে দেশ অসম্মত তবে বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষানীতি হিসাবে ত্যাগ করাই সরকারের উচিত হবে। অপর পক্ষে সরকার যদি বিশ্বাস করেন দেশের সবাক মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর কাছে মুখরোচক না হলেও দেশের অগণিত মূক জনসাধারণের মঙ্গল বুনিয়াদী শিক্ষার সমাজ ও শিক্ষাদর্শের মধ্যে নিহিত রয়েছে, এই শিক্ষাবিপ্লবে তাদের সম্মতি আছে, তবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে একে কার্যকর করার সর্ববিধ ব্যবস্থা

করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার সঙ্কট উপলব্ধি করে স্বাবলম্বী জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার কথা বলে গেছেন, গান্ধীজী এই শিক্ষার বাস্তব রূপদানের কর্মধারা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, কংগ্রেস একে জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বলে গ্রহণ করেছেন। আজ কংগ্রেসের হাতে দেশের শাসনভার রয়েছে, কংগ্রেসের কর্মপন্থা ও আদর্শের প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাসই সূচিত হচ্ছে এর দ্বারা। সুতরাং কংগ্রেসের স্বীকৃত শিক্ষাদর্শকে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় রূপ দেওয়াকে অগণতান্ত্রিক বলে আখ্যাত করা চলতে পারে না।

বুনিয়াদী শিক্ষা শিক্ষাবিপ্লব সূচিত করে, শিক্ষাসংস্কার নয়। আজ জগতে আমরা একটা সভ্যতার সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছি। জগতে এখানে ওখানে মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে একটি মুমূর্ষু সভ্যতা। এ সভ্যতার উৎস হচ্ছে কতকগুলি ট্যাবু। এ করো না, সে করো না, এমনি শত শত বাধা নিষেধ, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসন এই সভ্যতার উপজীব্য। যুক্তিবিচারহীন এই সভ্যতা বিজ্ঞানবিমুখ ; যুক্তির আলোকে তার ভয়। তাই আত্মবিশ্বাসের অন্ধকারে তার আশ্রয়, নির্ভয় বিচরণক্ষেত্র। বিশ্লেষণ নয়, স্মৃতিই এর পরম নির্ভর। রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন'-এ এর নিখুঁত রূপ আঁকা হয়েছে। এই সভ্যতার চিতাভস্মের উপর রচিত হয়েছে আজকার পৃথিবীর গতিপ্রধান সভ্যতা। চরৈবেতি চরৈবেতি হচ্ছে এই সভ্যতার মন্ত্র। এই সভ্যতার বিদ্যুৎলাঞ্ছন গতিবেগ, ঐশ্বর্যের উজ্জ্বলচ্ছটা এখনও আমাদের মুগ্ধ করে রেখেছে। কিন্তু যে সব দ্রষ্টা বর্তমান সভ্যতার মাতলামো থেকে আত্মস্থ হতে পেরেছেন

তাঁদের চোখে ধরা পড়েছে এই বিচিত্র আলোকচ্ছটার পিছনকার বিপুল কলঙ্ক-কালিমা ; ধরা পড়েছে যে এই সভ্যতার জীবনদেবতা হচ্ছে লোভ, এর একমাত্র কাম্য শক্তি। তাঁরা জেনেছেন যে এই সভ্যতা মত্ততা আনে, শান্তি দেয় না, কল্যাণকে ছেড়ে সত্যের সাধনা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ঘুরে মরে। মুক্তধারা, রক্তকরবী প্রভৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এই সভ্যতার অনুপম চিত্র অঙ্কিত করে গেছেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন "সত্যম্ শিবম্ অদ্বৈতম"—কল্যাণকে ছাড়া সত্য অপূর্ণ, সত্যকে ছাড়া কল্যাণ অসম্ভব—দুই একই সত্তা। তাই এই যুদ্ধক্ষত পৃথিবীতে নূতন করে শান্তির বাণীর প্রয়োজন হয়েছে, অসুন্দরকে সত্য বলে প্রচলিত করার যে মিথ্যা সাধনা চলছে তাকে ভ্রষ্ট বলে ঘোষণা করার লগ্ন এসেছে। সভ্যতা আজ যে পথ অবলম্বন করেছে তা পরিত্যাগ করে নূতন পথে চলার ডাক বার বার এসেছে আমাদের কাণে—আমরা তাকে স্বীকার করেছি, কিন্তু তাতে সাড়া দিইনি। সেই ডাককে অনুসরণ করে নূতন পথে চলার মত করে নিজেদের তৈরী করার জন্য নূতন শিক্ষার মন্ত্র দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী দিয়েছেন কার্যসূচী। "রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শ" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা রবীন্দ্রনাথের এই মন্ত্রটি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। গান্ধীজীর কর্মসূচী রয়েছে তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে। এই পরিকল্পনার মূল কথা হচ্ছে এই যে কেবল দেহের নয়, কেবল মনের নয়, দেহ-মন-আত্মার সুসমঞ্জস বিকাশের সাধনা করতে হবে আমাদের। প্রকৃতি বিরাট দেহের পরীক্ষা করেছিল একদিন, সে পরীক্ষা ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। বুদ্ধির চরম বিকাশের সাধনা প্রকৃতি করেছে

মানুষের মধ্য দিয়ে; সে সাধনা ব্যর্থ হয়েছে, কল্যাণকে সুন্দরকে লাভ আমরা করতে পারিনি। এবার নূতন সাধনার পালা—বিজ্ঞানকে লোভের সঙ্গ থেকে বিযুক্ত করতে হবে, জ্ঞানকে ক্ষমতা-লোলুপতা থেকে বিচ্যুত করার সাধনা করতে হবে। টলষ্টয়, রোলাঁ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী আমাদের বিজ্ঞানবিমুখ হতে আহ্বান করেননি, তাঁরা নূতন সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য ডাক দিয়েছেন, যে সভ্যতা বিজ্ঞানকে চরম সার্থকতা দেবে তাকে কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করে, ব্যক্তিকে এক অখণ্ড অস্তিত্বের অংশ বলে ভাবতে শিখিয়ে পরস্পরের সখ্যবন্ধনকে পরিস্ফুট করে তুলবে। বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য এই বিপ্লব, এর কম কিছু নয়।

কোন বিপ্লব সাধন করতে হলে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর দরকার। অপরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রচলিত ব্যবস্থার ওলটপালট করা চলে না। পরাধীনতার যুগে আমরা সাহেব হবার জন্য সাধনা করেছি, তাদের জীবনযাত্রার মানকেই আমরা আদর্শ বলে মেনে নিয়েছি। পিছনের দিকে, দেশের অগণিত জনসাধারণের দিকে তাকাবার অবকাশ তখন আমাদের হয়নি। তাই দেশে সেদিন বিচ্ছিন্ন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল ; আমাদের মধ্যে যাঁরা শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা নিজেদের "জীবনের মান" বাড়াবার জন্য আত্মবিক্রয় করতে, স্বদেশকে বিক্রয় করতে দ্বিধাবোধ করেননি। সেইজন্যই মুষ্টিমেয় গোরা সৈন্য নিয়ে ইংরেজের পক্ষে দু'শ বছর প্রবল পরাক্রমে আমাদের দেশে রাজত্ব করে যাওয়া অসম্ভব হয়নি। যুদ্ধে আমরা যত না পরাজিত হয়েছিলাম, তার চাইতে বেশী হয়েছিলাম পাশ্চাত্য সভ্যতার আক্রমণে। ফলে ইচ্ছা করেই আমরা অনেকটা তাদের জোয়াল কাঁধে বয়েছি।

দেশ স্বাধীন হবার পর লগ্ন এল নূতন করে ভাবার, নূতন পথে চলার। এই নূতন পথ ছিল ইংরেজী সভ্যতাকে আরও ভাল করে আত্মস্থ করার মধ্যে নয়, দেশের জনসাধারণের দিকে ফিরে চাওয়ার মধ্যে। আমাদের এমন পথ অনুসরণ করার প্রয়োজন ছিল যাতে দেশের প্রত্যেকটি নরনারী মনুষ্যত্বের দিকে এগিয়ে যেতে পারে, দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। এই নূতন পথে চলার জন্য যে দৃষ্টি প্রয়োজন তা গান্ধীজীর ছিল। তাই তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন শাসকদের দরিদ্র জনসাধারণের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য ; ধনী দরিদ্রের মধ্যে, শাসক শাসিতের মধ্যে ব্যবধানটা যতদূর সম্ভব কমিয়ে ফেলার জন্য ; ইংরেজের তৈরী আত্মবিচ্ছেদের ফাটলটা যতদূর সম্ভব জোড়া লাগাবার জন্য। কিন্তু আমরা তাঁর সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারিনি। ফলে আত্মসচেতনতার, আত্মোপলব্ধির যে শুভলগ্ন এসেছিল তা আমরা হারিয়েছি। রবীন্দ্রনাথের অনুপম ভাষায় বলি : "পোলিটিক্যাল সাধনার চরম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে একত্র করা। কিন্তু দেশের ভাষা ছাড়িয়া, দেশের প্রথা ছাড়িয়া, কেবলমাত্র বিদেশীর হৃদয় আকর্ষণের জন্য বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে।"* স্বাধীনতা লাভের পর আমরা জাতীয় ভাষা, জাতীয় প্রথার দিকে অনেকটা নজর দিয়েছি বটে কিন্তু দেশের হৃদয়কে এক করার চাইতে বিদেশীর হৃদয় আকর্ষণ করার দিকেই আমাদের নজর রয়েছে বেশী। তাই বিদেশীর শাসন-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েও আমরা ব্যয়বহুল বিদেশী কাঠামোটাকে

* সমূহ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বজায় রেখে তাদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছি কিন্তু মুমূর্ষু দেশবাসীর হৃদয়ে নব অরুণোদয়ের কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না।

বুনিয়াদী শিক্ষাকে সার্থক করতে হলে যাঁদের এই বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী আছে, এই নূতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে যাঁদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে, যাঁরা দেশের হৃদয়কে এক করার যোগ্যতা রাখেন, দেশের কোটি কোটি লোকের জীবনের সুখ দুঃখকে নিজের করে নেওয়ায় যাঁদের সানন্দ সম্মতি আছে তাঁদের হাতে এর সংগঠনের ভার তুলে দিতে হবে। পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন এজন্য হয়তো আছে; কিন্তু প্রচুর পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও যদি গান্ধীজীর জীবনধারাকে নিজ জীবনে গ্রহণ করতে অক্ষমতা বা অসম্মতি থাকে তবে বুনিয়াদী শিক্ষার সংগঠনের কাজ তাঁর দ্বারা হতে পারে না। আজকাল একটা কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে যথেষ্ট টাকা না দিলে যোগ্য লোক পাওয়া সম্ভব নয়। সমগ্র দেশের অসহ দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করে যাঁরা নিজের সুখের জন্য লালায়িত, দেশবাসীর অর্থে শিক্ষালাভ করে সে শিক্ষাকে জেশবাসীর সেবায় নিয়োগ করতে যাঁরা কুণ্ঠিত তাঁদের যোগ্যতা কিসের যোগ্যতা? আমরা অর্থকে প্রয়োজনাতিরিক্ত মর্যাদা দিয়েছি বলেই আজ এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। গান্ধীজীর স্বপ্নকে সার্থক করতে হলে অর্থকে এই অবাঞ্ছিত কৌলীন্য থেকে মুক্ত করতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষার সংগঠনের ভার যাঁদের হাতে থাকবে তাঁদের গান্ধীজীর সমবণ্টনের নীতিকে জীবনে স্বীকার করে যেওয়া চাই। মানুষ যোগ্যতা অনুসারে কাজ করবে, প্রয়োজন অনুসারে ভোগ করবে; অর্থের প্রাচুর্যে সম্মান থাকবে না, থাকবে কর্মের গৌরবে; সেই কাজই শ্রেষ্ঠতর বলে বিবেচিত হবে যাতে দাবী কম,

দায়িত্ব বেশী। সরকারীভাবে গান্ধীজীর শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে সরকারীভাবে এই নীতিকে মেনে নেওয়া দরকার। একদা এই নীতির উপরই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেদিন ব্রাহ্মণত্ব লাভ করার জন্য ঐশ্বর্যবানেরও প্রযত্নের অভাব ছিল না। আজও যদি এই নীতিকে স্বীকার করে নেওয়া হয় তবে কাজের গৌরবের জন্য কাজের দায়িত্ব নেবার লোকের অভাব হবে না। একদিকে বিলাস আর অন্যদিকে অসহ দারিদ্র্যের দুমুখী স্রোত যতদিন না রুদ্ধ হবে ততদিন গান্ধীজীর স্বপ্ন সফল হবার কোন সম্ভাবনাই নেই। সহস্র টাকা মাইনের কর্মচারী ৪০।৪৫ টাকা মাইনের অর্ধভুক্ত শিক্ষকের কাছে দেশপ্রেম, জাতিগঠন প্রভৃতির বড় বড় বুলি আউড়ে কখনও তাঁকে কর্তব্যকর্মে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন না। উদ্বুদ্ধ করার জন্য আদর্শ স্থাপন প্রয়োজন, নইলে বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য যা কিছু ব্যয় করা হবে তা শুধু অপচয়ই হবে মাত্র।

বুনিয়াদী শিক্ষার সত্যকার সংগঠন নিম্নোক্তভাবে হতে পারে ঃ

(১) ১০ থেকে ১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নিয়ে একটি প্রাথমিক শিক্ষা এলাকা গঠিত হবে। এই এলাকা এমন হবে যে এলাকার অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়গুলির উৎপাদিত শিল্পদ্রব্য থেকে এলাকার বিদ্যালয়গুলির জন্য প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষোপকরণ প্রস্তুত হতে পারবে। একজন দক্ষ শিক্ষাকর্মীর পরিচালনায় অঞ্চলের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হবে। প্রত্যেক গ্রামে গ্রামবাসীদের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক-একটি গ্রাম্য সমিতি গঠিত হবে। এই সব শিক্ষা সমিতির কাজে হবে নিজ নিজ গ্রামের শিক্ষা বিশেষতঃ পূর্ববুনিয়াদী ও বয়স্ক-শিক্ষা সম্পর্কে তৎপর হওয়া। প্রত্যেক

গ্রামের শিক্ষাসমিতির প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রাথমিক অঞ্চলের শিক্ষাসমিতি গঠিত হবে। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষাকর্মী এই সমিতির সম্পাদকরূপে কাজ করবেন। এই আঞ্চলিক শিক্ষাসমিতি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কর ধার্য করতে পারবেন এবং আদায়ীকৃত কর থেকেই অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হবে। যতদিন দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোকে পরিবর্তিত করে গ্রামকে একতরফা শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব না হবে ততদিন কেন্দ্রীয় সহায়তা দরকার হবে।

(২) প্রত্যেক জেলায় একটি করে এবং প্রত্যেক প্রদেশে একটি প্রাথমিক শিক্ষাবোর্ড থাকবে। এই বোর্ডগুলির কাজ মোটেই শাসনসংক্রান্ত হবে না। বর্তমানে উর্ধ্বতন এবং অধস্তন কর্মচারী এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে সম্পর্ক তা হচ্ছে চোর আর পুলিসের সম্পর্ক। ধরে নেওয়া হয়েছে যে অধস্তন কর্মচারী অথবা প্রতিষ্ঠান সর্বদাই কর্তব্যে ফাঁকি দিতে ব্যস্ত; উর্ধ্বতন কর্মচারী অথবা প্রতিষ্ঠানের কাজ হচ্ছে এই চুরি ধরা। চোর পুলিশের সমাজের এই ধারণা আমাদের একেবারেই বর্জন করতে হবে। সংগঠন সম্পর্কে এই ধারণার ফলে সমাজে চোরকে ধরার কৌশল আবিষ্কারের এবং চোরের দিক থেকে সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে চুরি করার কৌশল আবিষ্কারের প্রতিযোগিতা চলেছে। আমাদের জাতীয় প্রতিভার অনেকখানি কেবলমাত্র এইরকম চোর ধরার কৌশল আবিষ্কার করতে এবং হিসাবপত্রের ফাইল ঘাঁটতেই অপচয়িত হচ্ছে।

জেলা ও প্রাদেশিক বোর্ডের কাজ হবে : (ক) শিক্ষাসম্পর্কিত

গবেষণা পরিচালনা করা, (খ) স্ব স্ব অঞ্চলের প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং আঞ্চলিক ভিত্তিতে গবেষণার ফলাফল ও কার্যবিবরণী প্রকাশ করা, (গ) বুনিয়াদী শিক্ষাসংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশ, (ঘ) অঞ্চলের শিক্ষকদের জন্য সম্মেলন, প্রদর্শনী ও শিক্ষামুলক আলোচনার ব্যবস্থা করা, (ঙ) শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা, (চ) প্রয়োজনমত কোন অঞ্চলের আহ্বানে সেখানে গিয়ে অস্থায়ী শিক্ষাশিবিরের ব্যবস্থা করা, (ছ) যাতে শিক্ষকরা তাঁদের অবকাশ সময়ে বোর্ডের পরিচালিত শিক্ষাকেন্দ্রে সপরিবারে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বসবাস করতে পারেন এবং নূতনতম পদ্ধতি, শিক্ষার উপকরণ ও গ্রন্থাদির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পান, তার ব্যবস্থা করা। অবশ্য এজন্য পূর্বেই যোগাযোগ করে যথাবিহিত ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিক অঞ্চলের শিক্ষা-সমিতিগুলি প্রয়োজন অনুভব করলে প্রত্যেক মহকুমা এমন কি থানার জন্যও জেলা অথবা প্রাদেশিক বোর্ডের মত শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। প্রাথমিক অবস্থায় বিশেষভাবে এই সকল শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনার জন্য ধার্য কর থেকে এই সব কেন্দ্রের ব্যয় নির্বাহ হবে। কিন্তু ১০।১২ বৎসরের মধ্যে এরকম কেন্দ্রগুলির আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা চাই।

প্রত্যেক প্রাথমিক অঞ্চল থেকে একজন করে প্রতিনিধি নিয়ে এক-একটি থানা শিক্ষাসমিতি গঠিত হবে। এই সমিতির প্রধান কাজ হবে জেলা বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। জেলা এবং প্রাদেশিক শিক্ষাবোর্ড গঠিত হবে কেবলমাত্র শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে। এই সব বোর্ডের পরিচালিত শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয়

যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষক চাওয়া হবে। জেলার ক্ষেত্রে প্রাথমিক অঞ্চলের শিক্ষাকর্মীরা জেলাবোর্ডের জন্য এবং প্রদেশের ক্ষেত্রে জেলাবোর্ডের প্রতিনিধিরা প্রাদেশিক শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করবেন। এইভাবে নির্বাচিত হওয়ার ফলে যে বেতনের দিক দিয়ে খুব বেশী কিছু সুবিধা হবে তা নয়, কিন্তু এর ফলে নির্বাচিত কর্মী প্রশস্ত কর্মক্ষেত্র পাবেন, তাঁর কাজের দিক দিয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ কর্মী বলে স্বীকৃতি পাবেন। অর্থের লোভ নয়, কর্মের এই সুযোগই হবে শিক্ষাকর্মীর প্রকৃত আকর্ষণ। এই হবে যে কোন শিক্ষাকর্মীর প্রকৃত আকর্ষণ, এই হবে যে কোন শিক্ষাকর্মীর শ্রেষ্ঠ কাম্য। পদমর্যাদার সঙ্গে অর্থ আজ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে ; এই যোগ একান্ত অবাঞ্ছিত। অবশ্য শিক্ষককে একান্তভাবে তাঁর কাজে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ দেবার জন্য তাঁকে আর্থিক দৈন্যের উর্ধ্বে রাখতেই হবে ; কিন্তু অর্থকে স্তূপীকৃত করার সুযোগ কোথাও থাকবে না। শিক্ষকের জন্য যোগ্য ব্যবস্থা করতে হবে প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং ব্যবস্থা দিয়ে, অর্থ দিয়ে নয়।

বুনিয়াদী শিক্ষার যথার্থ সংগঠনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই আমূল পরিবর্তন একদিনে সম্ভব নয়। অন্তর্বর্তীকালের জন্য অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে। কিন্তু যদি সেই ব্যবস্থায় বুনিয়াদী শিক্ষার মূল নীতিগুলিকে বিসর্জন দেওয়া হয় তবে সেই ব্যবস্থা কখনই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে সহায়তা করতে পারবে না। তাই আদর্শকে সুস্পষ্টভাবে সামনে রেখে তাকে কার্যকরী করার জন্যই আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্তব্য। বর্তমানে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি করা যেতে পারে :

(১) গান্ধীজীর সর্বোদয় সমাজাদর্শে বিশ্বাসী বিশিষ্ট শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে একটি প্রাদেশিক বুনিয়াদী শিক্ষাবোর্ড গঠন করা। বোর্ড রাজ্যের বুনিয়াদী শিক্ষাসংক্রান্ত পরিকল্পনা রচনা করবেন এবং তাকে কার্যকরী করার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই বোর্ডের পরিকল্পনার ভিত্তিতে শিক্ষাদপ্তর সংসদে বুনিয়াদী শিক্ষা-সংক্রান্ত বাজেট বরাদ্দের দাবী পেশ করবেন এবং মঞ্জুরীকৃত বরাদ্দ এই বোর্ডের মারফৎ ব্যয়িত হবে। (২) এই বোর্ডের এক কিংবা একাধিক ব্যক্তি সর্ব সময়ের জন্য সম্পাদক থাকবেন। তাঁদের বর্তমানে মাসিক ২৫০৲ টাকা ভাতা দেওয়া হবে। তবে যাতায়াত ও অফিস সংক্রান্ত খরচপত্র এতদরিক্ত দিতে হবে। এই ভাতা এই নীতি অনুসারে দেওয়া হবে যে বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ভাতা সর্বনিম্ন ভাতার ৫ গুণের বেশী হবে না। হাজার টাকা মাইনের একজন কর্মচারী যখন সামান্য বেতনের অর্ধভুক্ত, চিন্তাক্লিষ্ট শিক্ষককে ত্যাগ, দেশপ্রেম, জাতিগঠন ইত্যাদি সম্পর্কে উপদেশ দেন তখন অমানুষিক ব্যঙ্গ করা হয় মাত্র। এই ব্যঙ্গ, মনুষ্যত্বের এই অবমাননা আমাদের অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ করার নীতি স্বীকৃত হয়েছে। সেখানে সর্বোচ্চ পদে যিনি অধিষ্ঠিত থাকবেন তাঁর জীবনযাত্রা, আয়-ব্যয় এমন হওয়া চাই যাতে প্রাথমিক শিক্ষককে ভীত, কৃত্রিম, সন্দিগ্ধ না করে আকর্ষণ করার আবহাওয়া সৃষ্ট হতে পারে। অসমানের সখ্য অর্থহীন। যাঁদের জীবনের প্রাত্যহিক সমস্যা এক তাঁরাই অন্তরের টানে একত্রিত হতে পারেন, শুধু সেক্ষেত্রেই একজন আর একজনকে সমস্যার সমাধানের পথের সন্ধান দিতে পারেন। ২৫০৲ টাকা মাসিক

মাইনেতে প্রদেশের বুনিয়াদী শিক্ষার দায়িত্ব নেবার যোগ্য লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না একথা মনে করার কোন কারণ নেই। গান্ধীজীর এই বিপ্লবে যাঁরা বিশ্বাসী শুধু এরকম ব্যবস্থা হলেই তাঁরা এগিয়ে আসতে পারেন বলে আমি বিশ্বাস করি। এরকম কর্মীর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে খুব কম বলে মনে করার কোন কারণ দেখতে পাই না। আইনের দিক থেকেও একটা বিশেষ বিভাগের জন্য এরকম বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব বলে মনে হয় না। উড়িষ্যার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী মুখ্যমন্ত্রীত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে ৩০০৲ মাসিক মাইনেতে উড়িষ্যার বুনিয়াদী শিক্ষার বিশেষ কর্মচারী-রূপে কাজ করেছেন। উড়িষ্যায় যা আইনে বাধেনি পশ্চিমবাংলায় তা অসম্ভব হওয়ার কোন কারণই দেখতে পাই না। তাছাড়া আইন-গত কোন বাধা যদি থাকেও তবুও আদর্শগত বাধাকে দূর করার জন্য আইনকে পরিবর্তিত করার ব্যবস্থা না হলে আমাদের স্বাধীনতা সত্যই ব্যর্থ হবে। বুনিয়াদী শিক্ষাক্ষেত্রে যাঁরা বর্তমানে কাজ করছেন তাঁরা যদি এই সর্বোচ্চ বেতনের চাইতে অধিকতর বেতনের প্রত্যাশী হন তবে তাঁদের সহজেই বর্তমান ধরণের স্কুল, কলেজ বা শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। তাঁদের মধ্য দিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রভাব অন্ততঃ খানিকটাও সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে এসে পড়বে এবং এতে শিক্ষার ভবিষ্যৎ রূপান্তরীকরণে সুবিধাই হবে।

(৩) প্রাথমিক শিক্ষকদের সর্বনিম্ন ভাতা অন্ততঃ ৫০৲ নির্ধারিত করা একান্ত আবশ্যক। এর কম অর্থে কোন শিক্ষকই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে কাজ করতে পারেন না। এজন্য প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে যে অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে তার সবটাই অপচয়

হচ্ছে। (৪) প্রত্যেক জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বুনিয়াদী বিদ্যালয় গড়ে তোলার পরিবর্তে একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষণ-শিক্ষালয়-সমন্বিত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের চতুষ্পার্শ্বে এক একটি ঘনসন্নিবিষ্ট এলাকা গড়ে তুলতে হবে। যে সকল জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে বুনিয়াদী বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে সেখানে শুধু বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির জন্য একজন বুনিয়াদী শিক্ষণ-প্রাপ্ত অবর বিদ্যালয়-পরিদর্শকের ব্যবস্থা করতে হবে। (৫) বুনিয়াদী শিক্ষণ-বিদ্যালয় ও -মহাবিদ্যালয়কে ক্রমে এই আদর্শের অনুযায়ী করে পুনর্গঠিত করতে হবে।

অন্তর্বর্তী কালে বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থাকে কেন্দ্রীয় আর্থিক সহায়তার উপর নির্ভর করতেই হবে। বর্তমান আর্থিক সংগঠন, করব্যবস্থা ইত্যাদি এর জন্য দায়ী। কিন্তু ক্রমে কেন্দ্রের উপর আর্থিক নির্ভরশীলতা বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

স্থান নির্বাচন ঃ

বীজ বপন করে তা থেকে সুফল পাবার আশা করতে হলে আগে জমি ভালভাবে তৈরী করা দরকার। ভাল বীজও পাথরের উপর ছুঁড়ে দিলে অঙ্কুরিত হয় না। আবার চারাগাছকে ঘিরে রাখতে হয়। যে চারাটি একদিন মহামহীরুহে পরিণত হবে তাকেও তার শৈশবে ছাগল, গরু, বাছুরের গ্রাস থেকে বেড়া দিয়ে রক্ষা না করলে চলে না। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতিষ্ঠার বেলাও এই কথা প্রযোজ্য। বুনিয়াদী শিক্ষা এখনও বীজের মত, এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এখনও এর ভ্রূণের মধ্যেই সুপ্ত রয়েছে। এই অবস্থায় একটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন করে এবং তার প্রতি প্রাথমিক অবস্থায় সযত্ন মনোযোগ না দিয়ে এর ভবিষ্যৎ

সম্ভাবনা সম্পর্কে বিচার করতে গেলে সুফল পাবার কোন সম্ভাবনা নাই। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতিষ্ঠা করে আমরা যদি বর্তমান সমাজের রূপান্তর ঘটাবার প্রয়াস করি তবে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচনের বেলায় আমাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে ঃ

(১) অনেক জায়গায় কর্মীদের দীর্ঘকালব্যাপী প্রচেষ্টার ফলে গান্ধীজীর গঠনকর্মের প্রতি গ্রামবাসীদের একটা অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে; তেমন স্থানেই যদি অন্যান্য দিক থেকে সুবিধাজনক হয়, প্রথম বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য চার হাজার টাকা ও ছয় বিঘা জমি দেওয়ার প্রস্তাবকে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বলে মেনে নেওয়া প্রায়ই ভুল হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর ফলে গ্রামে ২৮ হাজার টাকার সরকারী সাহায্য পাওয়া যাবে এই বিবেচনাটাই প্রধান থাকে। চার হাজার টাকার আর্থিক সাহায্য যে সব গ্রাম থেকে জোটে সেগুলি প্রায়ই প্রধানতঃ উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অধিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষার মধ্য দিয়ে যে জীবনযাত্রা সমাজে প্রচলিত করার চেষ্টা করা হয় এই সম্প্রদায় প্রায়শঃ তা মেনে নিতে পারেন না। ফলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়-গৃহটি পছন্দ করলেও এই সকল গ্রাম বুনিয়াদী শিক্ষা বা তার কর্মপদ্ধতিকে গ্রহণ করে না। এই সকল স্থানে সেজন্য বিদ্যালয়ে বুনিয়াদী শিক্ষার কার্যসূচী অনুসরণ করা এবং বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে জনমানসে এই শিক্ষার আদর্শের সংক্রমণ অত্যন্ত কঠিন হয়। যে জায়গার জীবনযাত্রা, কৃষি, ব্যবসা একান্তভাবে অর্থকেন্দ্রিক সমাজ-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল সেখানে বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

প্রথমে না করাই ভাল। এই বিবেচনার ভিত্তিতেই গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষার প্রয়োগ প্রথমে সহর বা সহরাঞ্চলে না করে গ্রামে করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

(২) যেখানে স্থানীয় যোগ্য শিক্ষক পাবার সম্ভাবনা বেশী বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলার সময় সেই সব স্থানকে প্রথমে নির্বাচন করা উচিত। বাইরে থেকে আমদানী করা শিক্ষক দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার কাজ চালান অত্যন্ত কঠিন। প্রাথমিক শিক্ষকের জন্য যে মাইনে নির্দিষ্ট আছে তাতে বিদেশে বাস করে এই মাইনের উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করা অসম্ভব। এর ফলে ক্রমাগত শিক্ষক পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং বিদ্যালয়ের কাজ অত্যন্ত ব্যাহত হয়।

(৩) বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রথম এমন জায়গায় প্রতিষ্ঠা করা উচিত যেখানে ক্রমশঃ তার চারদিকে একটি ঘনসন্নিবিষ্ট এলাকা গড়ে তোলা যায়। অর্থাৎ প্রথম স্থাপিত বিদ্যালয় কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কেন্দ্রস্থলে হওয়া উচিত এবং এই সকল বিদ্যালয় থেকে ঐ বিদ্যালয়ে যাতায়াতের পথ সুগম হওয়া প্রয়োজন। বুনিয়াদী শিক্ষাকে ক্রমশঃ ব্যাপক করে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার রূপান্তর ঘটাতে হলে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া নানা কারণেই প্রয়োজন হবে; বিচ্ছিন্নভাবে কতগুলি বিদ্যালয় গড়ে তুললে অর্থ, সময়, সামর্থ্য ও চেষ্টার অপচয় ঘটবে মাত্র।

(৪) প্রথম যে সকল বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপিত হবে তাদের সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য বিশেষজ্ঞদের সহায়তা প্রায়ই প্রয়োজন হবে। অপর পক্ষে যে বিদ্যালয় সার্থকভাবে গড়ে উঠবে তার প্রভাব জনসাধারণ ও কর্তৃপক্ষের উপর ফেলতে হলে বিদ্যালয় যাতায়াতের

সুগম পথের উপর অবস্থিত হওয়া উচিত। এজন্য প্রথম বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের স্থাপনকালে যাতায়াতের ব্যবস্থার সুগমতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

(৫) একান্ত দরিদ্র এলাকায় প্রথম বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন উচিত হবে না। কারণ এই সকল অঞ্চলে অর্থনৈতিক কারণে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি অত্যন্ত অনিয়মিত হবে। এর ফলে শিক্ষার ফলাফল এই সকল অঞ্চলে স্পষ্টভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হবে না।

শিক্ষক নির্বাচন :

যে কোন শিক্ষাব্যবস্থার সার্থকতার জন্য শিক্ষকের যোগ্যতা সবচেয়ে বেশী দায়ী। বুনিয়াদী শিক্ষার সার্থকতার জন্য যোগ্য শিক্ষকের প্রয়োজন আরও বেশী, কারণ শিক্ষকের কর্মক্ষমতা, বুদ্ধি, বিবেচনা ও কল্পনার উপর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজ খুব বেশী নির্ভর করে। এজন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্বাচন ব্যাপারে খুব সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

বুনিয়াদী বিদ্যালয় কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়; এখানে কোন না কোন শিল্পকাজকে কেন্দ্র করে শিক্ষা দেবার কথা। সুতরাং শিল্প সম্পর্কে যদি শিক্ষকের গভীর জ্ঞান ও শিল্পের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা না থাকে তবে সেই শিক্ষক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কিছুতেই সার্থকভাবে শিক্ষাদান করতে পারবেন না। আজকাল শিক্ষণ-শিক্ষা-কেন্দ্রে শিক্ষার্থী-শিক্ষক নেবার বেলায় তিনি ম্যাট্রিক পাশ কিনা এটাই প্রধানতঃ দেখা হয়। শিক্ষার্থী-শিক্ষক নির্বাচনের এই রীতি একান্ত ত্রুটিপূর্ণ। এর ফলে অনেক সময়ই এরকম দেখা যায় যে একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত যত শিক্ষক এলেন তাঁরা কাজের

মধ্যে সকলেই হয়তো সূতা কাটিতে জানেন, কারও বাগানের কাজের দিকে একটুও ঝোঁক নেই ; বা সকলেই হয়তো পড়াশুনা করতেই ভালবাসেন, মাঠে গিয়ে দৌড়ঝাঁপ খেলাধূলা কুচকাওয়াজ করার দিকে কারও আগ্রহ নেই ; গ্রামকে হয়তো কেউই আদৌ সহ্য করতে পারছেন না এবং এই পরিবেশ ছেড়ে পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছেন। শিক্ষার্থী-শিক্ষক নির্বাচনের বেলায় লেখাপড়ার বিষয়ে একটা নিম্নতম যোগ্যতা অবশ্যই দেখতে হবে ; কিন্তু বিভিন্ন কাজে রুচি, গ্রামের প্রতি ভালবাসা, কাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা বিচার করাও একান্ত প্রয়োজন। নূতন শিক্ষার্থী-শিক্ষক নির্বাচনের আগে কেবলমাত্র সে কি পাশ করেছে তা না জানবার চেষ্টা করে শিক্ষার্থী-শিক্ষক সত্যই গ্রামকে ভালবাসেন কিনা, গ্রামের সমস্যা তিনি কতদূর লক্ষ্য করেছেন এবং তার সমাধানের কি চেষ্টা করেছেন, তাঁর কোন শিল্পকাজের শিক্ষা আছে কিনা প্রভৃতি বিষয় জানা দরকার। এজন্য ভর্তির আবেদনপত্রে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি সন্নিবেশিত করা যেতে পারে। যদি শিক্ষার্থী-শিক্ষক আবেদনপত্র পাবার পর চেষ্টা করে জেনে নিয়ে এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেন তাহলেও তা লাভজনক হবে বলে মনে করি, কারণ তার ফলে কতকগুলি সমস্যার দিকে অন্ততঃ তাঁর দৃষ্টি পড়বে।

নিম্নলিখিত প্রশ্নমালা এজন্য ব্যবহার করা চলতে পারে ঃ

(১) আপনি শিক্ষকতা গ্রহণ করিতে চান কেন? শিক্ষককে সসম্মানে গ্রামে বাস করিতে হইলে কি কি প্রয়োজন মনে করেন ?

(২) আপনি বুনিয়াদী শিক্ষণ-শিক্ষা গ্রহণ করিতে চান কেন ?

এই শিক্ষাব্যবস্থা ও তাহার প্রবর্তক সম্পর্কে আপনি কি জানেন? আপনি নিজের জীবনে ইহা হইতে কিছু গ্রহণ করিয়াছেন কি?

(৩) শিক্ষণ-শিক্ষালাভের পর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে চাকুরী না পাইলে আপনি কি করিবেন?

(৪) আপনার গ্রামে কত ঘর লোকের বাস? লোক-সংখ্যা কত? ইহার মধ্যে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়সের কত ছেলেমেয়ে আছে? ইহাদের মধ্যে শতকরা কতভাগ বিদ্যালয়ে আসে? যাহারা আসে না তাহারা কেন আসে না? তাহাদের বিদ্যালয়ে আনিবার কি উপায় আছে বলিয়া মনে করেন?

(৫) আপনার গ্রামে কি কি জাত ও পেশার লোক আছে? গ্রামের লোকেরা কৌলিক পেশা অবলম্বন করে কি? কোন্ কোন্ শিল্প আপনার গ্রাম হইতে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে অথবা যাইতেছে? ইহার কারণ কি এবং কি প্রতিকার আছে বলিয়া মনে করেন?

(৬) আপনার গ্রামের স্বাস্থ্য কিরকম? বিদ্যালয়ের মারফৎ গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতি করার জন্য কিছু করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় কি? আপনি কি গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য এযাবৎ কিছু করিয়াছেন? প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে আপনার কতখানি অভিজ্ঞতা আছে?

(৭) কি কাজ আপনি সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন? সেই কাজের জন্য দৈনিক আপনি কত সময় ব্যয় করেন?

(৮) আপনি কি কি শিল্পকাজ জানেন? আপনার তৈরী হাতের কাজের কোন নমুনা আছে কি?

(৯) আপনি কি চাষের কাজে অংশ গ্রহণ করেন? চাষের

কোন্ কোন্ কাজ আপনি নিজে করিতে পারেন? গ্রামাঞ্চলে চাষের উন্নতির জন্য কি কি করা দরকার বলিয়া আপনি মনে করেন?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর থেকে শিক্ষকের চরিত্র, আগ্রহ ও দৃষ্টিভঙ্গীর অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যাবে। শিক্ষার্থী-শিক্ষক যদি চেষ্টা করে জেনে প্রশ্নগুলির উত্তর দেন তবে তাতেও কোন ক্ষতি নেই বরং লাভ আছে। আর তিনি যদি এজন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন তবে কার্যক্ষেত্রে তাঁর মিথ্যাবাদিতা অতি সহজেই ধরা পড়বে এবং এটাই তাকে অযোগ্য বলে সিদ্ধান্ত করার সব চাইতে বড় কারণ হবে। বুনিয়াদী শিক্ষায় পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানের চাইতে শিল্পের বিষয়ে ঝোঁক ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর দাম কোন অংশে কম নয়। ভাল ভাষাজ্ঞান, ভাল হাতের লেখা ও পরিষ্কার যুক্তিবাদী মন হলে কেবলমাত্র স্কুল কলেজের শিক্ষার অভাব তাঁর বুনিয়াদী শিকক হবার পথে বাধা হওয়া উচিত নয়।

একসঙ্গে পাঁচ-শ্রেণীযুক্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলা উচিত হবে না বলে মনে করি। যে সকল গ্রামে কোন বিদ্যালয়ই নেই সেরকম জায়গায় বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপনের কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। প্রথম বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলার জন্য কিরকম স্থান নির্বাচন করা প্রয়োজন তা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। এরকম স্থানে অন্ততঃ বর্তমান ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকবে এ অবশ্যই আশা করা যেতে পারে। হঠাৎ একদিনে এরকম বিদ্যালয়ের পাঠ্য আগাগোড়া পালটে দিয়ে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কার্যক্রম গ্রহণ করলে কোন লাভ হবে না বলে মনে করি। তাছাড়া, এরকম রাতারাতি পরিবর্তন শিক্ষাদানপদ্ধতির দিক

থেকেও যুক্তিযুক্ত হবে না। সাফাই, প্রার্থনা, খেলাধূলা এবং পড়াশুনার সঙ্গে একটু শিল্পকাজ অবশ্য সব শ্রেণীতেই জুড়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু গোড়া থেকে সুরু না করলে হঠাৎ তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শ্রেণীতে শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদান আরম্ভ করা সম্ভব নয়। এতে শিক্ষার্থীরা বিহ্বল হয়ে পড়বে মাত্র, তাতে তাদের লাভ কিছুই হবে না। বস্তুতঃ আজকাল বুনিয়াদী শিক্ষায় শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষার পরিবর্তে পড়াশুনার সঙ্গে খেলার মত একটু একটু শিল্পকাজ করা চলছে মাত্র। এতে শিক্ষাদান পদ্ধতির মৌলিক রূপান্তর কিছুই ঘটেনি, পোষাকটা খানিক পালটেছে মাত্র। সত্যই শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষার প্রবর্তন করতে হলে প্রথম দুজন শিক্ষক নিয়ে গোড়ায় দুটি শ্রেণীর রূপান্তর ঘটানো প্রয়োজন; এর পর প্রতি বৎসর একটি করে শ্রেণীতে বুনিয়াদী শিক্ষার কার্যক্রম প্রচলিত করতে হবে।

এভাবে সাধারণ বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত করতে হলে প্রথম দুজন বুনিয়াদী শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক প্রয়োজন। এঁদের মধ্যে একজন থাকবেন যিনি ভবিষ্যৎ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষক হবেন। শিক্ষার দিক থেকে এঁর একজন গ্র্যাজুয়েটের সমান জ্ঞান থাকলে ভাল হয়। প্রথম যে দুজন শিক্ষক সাধারণ বিদ্যালয়ে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কার্যসূচী অনুসরণ করতে আরম্ভ করবেন তাঁদের একজনের সঙ্গীত ও চিত্রকলায় এবং অপর জনের বিজ্ঞান ও শিল্পকাজে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের মুখস্থ বিদ্যার চাইতে বৈজ্ঞানিক মন ও অভ্যাস অবশ্যই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। বিদ্যালয়কে শিক্ষার উপযুক্ত মাধ্যমরূপে প্রস্তুত করার

জন্য কি করা দরকার তা পূর্বেই আলোচনা করেছি। একাজের জন্য একজন শিল্পীর প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। তাছাড়া প্রথম শ্রেণীর কার্যক্রম প্রধানতঃ নাচ-গান-হল্লাকে কেন্দ্র করেই হবে। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বয়স হবে ৬ বৎসর। এই বয়সে শিল্প কাজের অতি প্রারম্ভিক কাজগুলির সুরু হবে মাত্র। এ সময়ে চঞ্চল শিশু অতি অল্প সময়ই একদিকে মনোনিবেশ করতে পারবে এবং এই একাগ্রতা ছাড়া শিক্ষামূলক শিল্পকাজ সম্ভব নয়। একান্তই খেলার অঙ্গ হিসাবে প্রথম শ্রেণীতে শিল্পকাজের গোড়া পত্তন হবে। এই বয়সে শিশুকে যা সবচেয়ে সহজে আকর্ষণ করতে পারে তা হচ্ছে বর্ণ- আর সুর-বৈচিত্র্য। বর্ণবৈচিত্র্য ও সুরবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই শিশুর মনে জীবে প্রেম, রুচিবোধ, দেশাত্মবোধ, সামঞ্জস্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। এই ভাললাগার মধ্য দিয়েই শিশুর একাগ্রতা, সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি করার ইচ্ছা প্রভৃতি বাড়তে থাকবে। বিদ্যালয়কে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে তুলতে, সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে বসতে, চলাফেরা করতে, সাধারণ জিনিষ দিয়ে নিজেকে ও নিজের পরিবেশকে সাজিয়ে তুলতে শেখাবেন যিনি তাঁর শিল্পী হওয়া প্রয়োজন। এজন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রারম্ভে একজন শিল্পী শিক্ষকের সহায়তা অপরিহার্য। অপর পক্ষে প্রত্যেক কাজের কারণ জানতে প্রত্যেক ঘটনাকে বিশ্লেষণ করতে শিশুকে প্রথমাবধি উৎসাহিত করতে হবে। এই উৎসাহ জাগ্রত করার জন্য এবং একে বাঁচিয়ে রাখার জন্য একজন বৈজ্ঞানিক মনোভাব সম্পন্ন শিক্ষক একান্ত প্রয়োজন। যিনি প্রধান শিক্ষক হবেন তাঁর প্রধান দুটি গুণ হবে চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব। তাঁর চরিত্র এমন হওয়া চাই

যাতে শিক্ষক-ছাত্র সকলের তিনি অনুকরণযোগ্য হতে পারেন, চরিত্রের গুণে যিনি গ্রামের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারবেন। তাঁর দৈহিক কাজের প্রতি নিষ্ঠা এবং গ্রামের প্রতি ভালবাসা থাকা চাই এবং বিদ্যালয়ে যে শিল্পগুলি শিক্ষা দেওয়া হবে তাদের গোড়ার কথার সম্পর্কে জ্ঞান ও অন্ততঃ একটি শিল্পে বিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকা চাই। অন্ততঃ একটি শিল্পে বিশেষ ব্যুৎপত্তি না থাকলে কারও পক্ষে শিক্ষামূলক শিল্পকাজের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বোঝা সম্ভব নয় এবং সেক্ষেত্রে অন্যান্য সহকর্মীদের শিক্ষাদান সম্পর্কে সহায়তা করা ও পরামর্শ দেওয়া এবং তাঁদের কাজের প্রগতির বিচার করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হবে। যে কোন প্রধান-শিক্ষকের বুনিয়াদী শিক্ষার তত্ত্ব, শিক্ষা- ও শিশু-মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাদানপদ্ধতি এবং বিদ্যালয় পরিচালনা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান তো অবশ্যই থাকা চাই। বিদ্যালয়ে প্রধান-শিক্ষক মনোনয়নই সবচেয়ে জরুরী কাজ; তিনিই হবেন সকল কর্মীর মধ্যে যোগসূত্র, তাঁর নেতৃত্বেই বিদ্যালয় গড়ে উঠবে। আজকাল সস্তা গণতন্ত্রের নামে এই নেতৃত্বকে অনেক সময় উপেক্ষা করা হয়, এর ফল অত্যন্ত ক্ষতিকর হয় বলে আমার ধারণা। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গোড়াতেই প্রধান-শিক্ষক নির্বাচন করা প্রয়োজন, উচ্চতর শ্রেণী খোলা হলে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন প্রধান-শিক্ষক নিযুক্ত করা হবে এই ধারণা আমি ভুল বলে মনে করি। বিদ্যালয় গড়ার গোড়ার দিকটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ; এই সময়েই সবচেয়ে যোগ্য লোকের প্রয়োজন সর্বাধিক।

বুনিয়াদী বিদ্যালয় যখন পাঁচ শ্রেণীর হবে তখন ছয়জন শিক্ষক থাকা উচিত। সাধারণতঃ হয়তো প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একজন

হিসাবে পাঁচজন শিক্ষক থাকবেন। অবশ্য কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যাটাই বড় কথা নয়। প্রয়োজন হলে চার কিংবা তিনজন শিক্ষকেরও পাঁচটি শ্রেণীর কাজ চালাতে পারা উচিত। অবশ্য এক একটি শ্রেণী বলতে এখানে ২৫।৩০ জন ছাত্রের এক একটি শ্রেণী ধরা হচ্ছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয় সর্বদাই খোলা থাকবে এবং শিক্ষকরা এক একজন করে পর্যায়ক্রমে ছুটী নেবেন এই বিবেচনার ভিত্তিতেই এখানে ছয়জন শিক্ষকের কথা বলা হয়েছে। ছুটি সম্পর্কে 'বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছুটি' শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।* আবার প্রয়োজন হলে—এবং দেশের বর্তমান অবস্থায় নিশ্চয়ই প্রয়োজন হবে—একজন শিক্ষক একাধিক শ্রেণীর ভার নিশ্চয়ই নিতে পারবেন। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কার্যসূচী তৈরী হবে বিষয়ের ভিত্তিতে নয়, কাজের ভিত্তিতে। কাজ করবার জন্য শ্রেণী হিসাবে বিভাগ তো অপরিহার্য নয়ই, বরং অনেক সময় কাজের পক্ষে এবং সহযোগিতার মনোবৃত্তি গড়ে ওঠার পক্ষে ক্ষতিকর। বাগানের কাজে যেমন কোদাল চালাবার প্রয়োজন আছে তেমনি খুরপী চালাবার প্রয়োজনও আছে। দুটো কাজের জন্যই পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র নিয়োগ সময় ও কর্মক্ষমতার অপচয় মাত্র। তেমনি সূতাকাটা বা কাপড়বোনার কাজে এমন প্রক্রিয়া আছে যেগুলি বার তের বৎসরের কম বয়সের ছাত্ররা করতে পারবে না, আবার অনেক প্রক্রিয়া আছে যা ছয় সাত বৎসরের বালক বালিকা সহজেই করতে পারে। এখানে পারদর্শীদের সহায়তায় অপারদর্শীরা এগিয়ে চলবে। কর্মক্ষমতায়, শিক্ষায় যারা

* বুনিয়াদী শিক্ষার কথা ২য় খণ্ড—অনিলমোহন গুপ্ত।

এগিয়ে আছে তারা অন্যদের সহায়তা করবে, এটাই হচ্ছে সহযোগিতা শিক্ষার মূল কথা। বুনিয়াদী বিদ্যালয় এই সহযোগিতা শিখানোরই ক্ষেত্র, সুতরাং শিক্ষকসংখ্যা কম থাকলেও শিক্ষককে ছাত্রদের সহযোগিতায় কাজ চালিয়ে নিতে সক্ষম হতে হবে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, ছাত্রদের সহযোগিতায় পরিচালিত শিক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট হয় না।* বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরীক্ষার এটা একটা অঙ্গ, পরে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রথম পাঁচটি শ্রেণীর জন্য পাঁচজন শিক্ষক থাকবেন এ যদি ধরে নেওয়া হয়, তবে এই শিক্ষকদের কিভাবে নির্বাচন করা হবে এটাই এবার আমরা বিচার করব। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের লক্ষ্য কি তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুকে স্বাশ্রয়ী, বিকেন্দ্রিত, শোষণহীন সমাজের যোগ্য নাগরিক করে গড়ে তুলতে হবে। তাকে দেহ-মন-আত্মায় পূর্ণ বিকশিত করতে হবে। সুতরাং শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবনই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম। শিক্ষাকর্মীরা সম্মিলিতভাবে জীবনের সকল দিক স্পর্শ করে বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারবেন এমনটি হওয়া চাই। এজন্য শিক্ষক নির্বাচনের সময় শিল্প ও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক সাবধানে নির্বাচন করতে হবে। পাঁচজন শিক্ষক নিম্নলিখিত দক্ষতা অনুযায়ী নির্বাচন করা দরকার : প্রধান শিক্ষকের কথা প্রথমেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

* বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি—বিজয়কুমার ও সাধনা

প্রত্যেক শিক্ষকেরই সূতাকাটা ও বাগানের কাজে দক্ষতা থাকা চাই। প্রত্যেক শিক্ষকের মাতৃভাষার উপর ভালরূপ অধিকার থাকা প্রয়োজন এবং প্রত্যেকের হস্তাক্ষর সুন্দর হওয়া দরকার। এ দুটি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পক্ষে অপরিহার্য গুণ বলে ধরা যেতে পারে। পাঁচজন শিক্ষকের মধ্যে অন্ততঃ একজনের মাতৃভাষার উপর বিশেষ দখল থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া বিভিন্ন শিক্ষকের নিম্নলিখিত কোন না কোন একটি বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা থাকা দরকার: (১) সূতাকাটা ও বয়ন, (২) কৃষি, (৩) বিজ্ঞান, (৪) সঙ্গীত ও চিত্রকলা, (৫) স্বাস্থ্যতত্ত্ব, লোকনৃত্য, খেলাধূলা ও ব্যায়াম। এঁদের মধ্যে অন্ততঃ একজনের সাধারণ-ভাবে কাঠ ও ধাতুর কাজ এবং একজনের রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা দেবার মত জ্ঞান থাকা দরকার। এখানে বিশেষ দক্ষতা বলতে কেবলমাত্র কাজ চালাবার মত বিদ্যা বোঝায় না। অনেক সময় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের বিবরণীতে দেখি, এক একজন শিক্ষক কৃষি, কাগজ তৈরী চামড়ার কাজ ইত্যাদি নানাপ্রকার কাজ জানেন। কিন্তু তাঁর কাজের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। কৃষির কাজে বিশেষ দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও যিনি দুবছর ধরে জমি পতিত ফেলে রাখেন, অথবা চামড়ার কাজ জানা থাকা সত্ত্বেও যিনি সরঞ্জামের অভাবে বছরের পর বছর একটুও চামড়ার কাজ করতে পারেন না তাঁর সে বিষয়ে দক্ষতা আছে বলা চলতে পারে না। শিক্ষণ-কেন্দ্রে কয়েকটি মডেল তৈরী করতে শেখা, অথবা বিদ্যালয়ের কার্যক্রম অনুযায়ী দিনগত পাপক্ষয়ের মত কতকগুলি কাজ করতে পারা বিশেষ দক্ষতা অর্জনের লক্ষণ নয়। যিনি যে কাজে দক্ষ তাঁকে সেই কাজ

বিদ্যালয়ে এবং সমাজে, অন্ততঃ নিজের জীবনে, প্রতিষ্ঠা করার শক্তি অর্জন করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠার শক্তি ও আগ্রহ যাঁর নেই, যিনি নিজের উৎপাদনব্যবস্থাকে যুক্তি দিয়ে সমর্থন এবং কার্যতঃ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না, তাঁর সে বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জিত হয়নি বলে বুঝতে হবে।

পাঁচশ্রেণীর বুনিয়াদী বিদ্যালয়, বুনিয়াদী বিদ্যালয় নামের অপব্যবহার মাত্র। যেরকম নাগরিক গড়ে তোলা বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য এই বয়সে মাত্র পাঁচ বৎসরের শিক্ষান্তে সেরকম নাগরিক গড়ে তোলা অসম্ভব। এই বয়সে দেহ-মন-আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ, জাতীয় ঐতিহ্যকে সম্যকরূপে গ্রহণ এবং পরবর্তী বিশেষ শিক্ষার যোগ্যতা নিরূপণ কোনটাই সম্ভব নয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষাশেষে অধিকাংশ ছেলেমেয়ে সংসারে প্রবেশ করবে। তারা যেন সংসারে নিজের স্থানটি বেছে নিতে পারে এবং নিজের প্রতিভার পূর্ণ প্রয়োগ করতে পারে, এটা বুনিয়াদী শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। ৫ বৎসর শিক্ষান্তে ১০-১১ বৎসর বয়সে ছেলেমেয়েদের যদি সংসারে ছেড়ে দেওয়া হয় তবে এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। এর ফলে আজকার প্রাথমিক শিক্ষায় যেমন বিরাট অপচয় ঘটে এবং সেই স্তরে যাঁরা শিক্ষা সমাপ্ত করেন তাঁরা যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবার অচিরকাল মধ্যে নিরক্ষর হয়ে পড়েন ভবিষ্যতেও সেইরকমই ঘটবে। বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য সকল ব্যয়কে আমরা যদি নিরর্থক করে তুলতে না চাই তবে আমাদের সর্বত্র আটশ্রেণীযুক্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে। এজন্য পূর্বোক্ত পাঁচজন ছাড়া আরও অন্ততঃ যে তিনজন শিক্ষকের প্রয়োজন হবে তাঁদের নিম্নলিখিত একটি না একটি

বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা থাকা চাই : (১) কার্ডবোর্ড, কাঠ ও ধাতুর কাজ, (২) পশুপালন ও চিকিৎসা, (৩) বিবিধ কুটিরশিল্প।

কিন্তু আমরা শিক্ষক নির্বাচনে যতই সাবধান হই না কেন, জীবনকে পরিপূর্ণভাবে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য এঁরা স্বয়ং-সম্পূর্ণ হবেন এ কখনও সম্ভব হবে না। এখানে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে একটি অত্যন্ত জরুরী কথা আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন। সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষকই বিদ্যার্থীর একমাত্র শিক্ষাদাতা। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ সর্ববিষয়ে শিক্ষাদান নয়। প্রকৃতপক্ষে ভাল মা বাপ যেমন নিজের সন্তানকে গড়ে তোলার জন্য যত্ন নেন, তাদের শিক্ষার জন্য যোগ্য লোকের ব্যবস্থা করে দেন, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজও ঠিক তাই। তিনি যে বিষয়ে বিশেষ নিপুণ সে বিষয়ে, কেবলমাত্র কোন একটা বিশেষ শ্রেণীকে নয়, যখন যাদের প্রয়োজন সম্ভবমত সকলকেই শিক্ষা দেবেন। অন্যান্য বিষয়ের জন্য যোগ্য ব্যবস্থা করে দেওয়াই হবে তাঁর কর্তব্য। তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষক গান জানেন না তবু তিনি তৃতীয় শ্রেণীকে গান শেখাবেনই, তা হতে পারে না। তবু কোন কোন ক্ষেত্রে একরকম ঘটনাও ঘটেছে এবং ফলে শিক্ষার্থীদের অনেকখানি ক্ষতি হয়েছে। প্রত্যেক শিক্ষক তাঁর তত্ত্বাবধানে যে সকল ছাত্র থাকবে তাদের সর্ববিষয়ে মঙ্গলের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। নিজের শ্রেণীর সঙ্গে প্রত্যহ আলোচনা, তাদের কাজ পর্যবেক্ষণ, তাদের দিনলিপি, বিবৃতি ও অন্যান্য খাতাপত্র দেখার মধ্য দিয়েই তিনি এদের প্রগতির সম্যক পরিচয় পেতে পারবেন। এই জ্ঞানের ভিত্তিতেই তাঁকে তাঁর ছাত্রদের জন্য যথাযোগ্য পরিকল্পনা রচনা ও ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক সাপ্তাহিক শিক্ষকসভায়

শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু শুধু এই যথেষ্ট হবে না। এই ব্যবস্থার জন্য তাঁকে সহায়তা নিতে হবে গ্রামের ভাল চাষীর, ভাল কামার-কুমোর-ছুতোরের, তাঁকে সসম্মানে ডেকে আনতে হবে গ্রামের বাউলকে, পটুয়াকে, স্মৃতিভার-সমৃদ্ধ গ্রামের গল্পরসিকদের। এভাবে বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যেকার প্রাচীর অবলুপ্ত হলে তবেই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সার্থকতার দিকে এগিয়ে যাবার পথ উন্মুক্ত হবে। আজকাল শিক্ষকরা গ্রামের সহায়তা নেবার কোন প্রয়োজন বা সার্থকতা আছে সেটা কল্পনাই করেন না, ফলে শিক্ষাসমস্যা ছাড়া শিক্ষকসমস্যাও আমাদের নানা-ভাবে বিব্রত করে। প্রয়োজনমত শিক্ষককে গ্রামের বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের শিক্ষাদান কার্যে নিয়োগ করতে হবে। অবশ্য এ ব্যাপারে শিক্ষার উপাদানগুলি সাজিয়ে নিতে প্রথম প্রথম শিক্ষককেই সহায়তা করতে হবে। এর ফলে গ্রামের সঙ্গে বিদ্যালয়ের যোগাযোগ যেমন বাড়বে, তেমনি শিক্ষার উপাদান সমৃদ্ধ ও বাস্তব হতে সহায়তা করবে। এর ফলে শিক্ষকের সংখ্যা নিয়ে সমস্যার সমাধানও অনেকখানি হবে। স্থানীয় পরিবেশ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং শিল্প শিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যালয় ও গ্রামের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আমার কাছে অপরিহার্য বলে মনে হয়।

শিক্ষক নির্বাচনে, আর একটি জরুরী ব্যাপার হল গ্রামের বা আশপাশের গ্রামের বাহির থেকে শিক্ষক আনার প্রশ্ন। প্রাথমিক শিক্ষকেরা যে মাইনে পেয়ে থাকেন তাতে বাড়ীতে খানিকটা সংস্থান না থাকলে শিক্ষকতা করে পরিবার পরিচালনা অসম্ভব। নিজ নিজ বাড়ী থেকে দূরে গিয়ে শিক্ষকতা করতে হলে জমিজমার প্রতি

যথাযোগ্য মনোযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ এ ছাড়া অন্নের সংস্থান করাও সম্ভব নয়। ফলে বিদ্যালয়ের কাজে ফাঁকি দিয়ে অধিকাংশ শিক্ষককে চাষবাসের কাজে মনোযোগ দিতে হয়। আপন গ্রাম ও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিক্ষকতার জন্য অন্য গ্রামে গিয়ে বসবাস বাঞ্ছনীয়ও নয়। এরকম ব্যবস্থায় শিক্ষক বিদ্যালয় ও গ্রামকে খুব কম ক্ষেত্রেই আপন করে নিতে পারেন। এর ফলে তাঁর সঙ্গে গ্রামের মঙ্গলের চাইতে পয়সার, বিদ্যালয়ের উন্নতির চাইতে চাকুরীর যোগ অধিকতর ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়। অন্য ব্যবস্থা অসম্ভব বলেও বটে আর অবাঞ্ছনীয় বলেও বটে, যথাসম্ভব স্থানীয় লোককেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করা উচিত। অবশ্য প্রাথমিক অঞ্চলগুলির কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে প্রয়োজন হলে বাইরের শিক্ষক অবশ্যই নিযুক্ত করতে হবে, কারণ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যোগ্যতার উপর সমগ্র অঞ্চলের শিক্ষার উন্নতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করবে।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সার্থকতার পক্ষে মহিলা-শিক্ষকদের প্রয়োজন সমধিক। বিশেষভাবে নীচের শ্রেণীর ছোট ছেলেমেয়েদের ভার নেবার পক্ষে মেয়েরাই সবচেয়ে যোগ্য। তাছাড়া, বুনিয়াদী শিক্ষাকে আটবৎসরব্যাপী এবং সার্বজনীন করতে হলে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত সহশিক্ষার ব্যবস্থা করতেই হবে। মহিলা-শিক্ষকের সহায়তা ছাড়া এ ব্যবস্থা সম্ভব হতে পারে না। উপরের শ্রেণীগুলিতে মেয়েদের দেখাশোনা করার জন্য শিক্ষয়িত্রীর নিয়োগ অপরিহার্য। কিন্তু গ্রামের মেয়েদের মধ্যে যোগ্য শিক্ষয়িত্রী মেলা আজকাল কঠিন। মেয়েদের অবশ্য আজকাল শিক্ষণ-শিক্ষা দিয়ে গ্রামে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু এর ফল বিশেষ ভাল হয়নি। তাঁরা গ্রামে গিয়ে

বেশীদিন টিকতে পারছেন না। ফলে তাঁদের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত অর্থের সম্পূর্ণ অপচয় ঘটছে। এভাবে দেশের বহুকষ্টার্জিত অর্থের অপব্যবহার করার কোন অধিকার আমাদের নেই। সরকারী অর্থ দেশের অর্থ। এই অর্থে যাঁরা শিক্ষালাভ করবেন অন্ততঃ একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাঁদের লব্ধ বিদ্যাদ্বারা দেশের সেবা অবশ্যই করতে হবে। ব্যবস্থার দোষে যদি তাঁদের কাজ করা অসম্ভব হয়ে থাকে তবে সেই অব্যবস্থা অবিলম্বে দূর করা প্রয়োজন। আর যদি ব্যক্তিগত সামান্য কারণে তাঁরা তাঁদের এই কর্তব্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হয়ে থাকেন তবে তাঁদের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবী করার অধিকার দেশের নিশ্চয়ই আছে।

মেয়েরা গ্রামে গিয়ে প্রধানতঃ নিম্নোক্ত তিনটি কারণে টিকতে পারছেন না দেখতে পাচ্ছি ঃ

(১) শিক্ষণ-শিক্ষা যাঁরা নিচ্ছেন তাঁরা প্রধানতঃ সহরে লালিত-পালিত ; গ্রামের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তাঁরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারছেন না।

(২) গ্রামে গিয়ে শিক্ষাদান এঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদর্শ বলে গ্রহণ করেননি ; তাই সুযোগ পেলেই এঁরা অন্য পেশা গ্রহণ করছেন।

(৩) অনেকেই এই শিক্ষকতাকে শিক্ষা ও বিবাহের অন্তবর্তী-কালের জন্য একটা কাজ-চালানো ব্যবস্থা বলে অনিচ্ছায় স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষাকে এতখানি মর্যাদা দেন না বা গ্রামকে এতখানি ভালবাসেন না যে কোন প্রাথমিক শিক্ষক বা গ্রামের চাষীকে বিয়ে করে আনন্দে দিন কাটাতে পারেন। এঁদের দৃষ্টি থাকে

সহরের দিকে, প্রাথমিক শিক্ষক ছাড়া অন্য পেশার লোকের দিকে। এর ফলে বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে।

এর সমাধান করতে হলে গ্রামের মেয়ে, বিশেষ করে বিবাহিতাদের দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। স্বামী স্ত্রীতে মিলে যদি শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন তবে আর্থিক সমস্যাটাও অনেকটা ঘুচতে পারে এবং কাজের স্থায়িত্ব সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যায়। অবিবাহিতা বা সহরের মেয়েরা বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসবেন না একথা বলি না, কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাঁদের সত্যই প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি এবং গ্রামের প্রতি দরদ থাকা চাই এবং একটা নির্দিষ্ট কাল কাজ করা সম্পর্কে তাঁদের নিশ্চয়তা দেওয়া প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্গঠন সম্পর্কে সর্বপ্রথমে বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষকদের কথা ভাবতে হবে। এঁরা অনেকেই দীর্ঘকাল ধরে গ্রামে রয়েছেন, গ্রামের জীবনযাত্রার সঙ্গে এঁদের পরিচয় নিবিড়। এঁদেরই জন্য সর্বপ্রথম যোগ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে এঁদের নূতন শিক্ষাধারার জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলা উচিত। প্রথমেই এঁদের শিক্ষার ব্যবস্থা করলে এঁরা নূতন শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে অধিকতর সহজে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন। প্রথম প্রথম বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অনেকরকম যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের প্রয়োজন হবে। এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সর্বত্রই শিক্ষকসংখ্যা অত্যন্ত কম, সুতরাং যেসব কাজ বর্ত্তমান শিক্ষকরা পারবেন না সে সকল কাজের জন্যই মাত্র নূতন শিক্ষক নিয়োগ করলেও চলবে। কিন্তু প্রথমেই নূতন শিক্ষকের শিক্ষা ও নিয়োগের ব্যবস্থা করলে আশঙ্কা, সন্দেহ, তিক্ততা,

এমনকি স্বার্থ-সংঘাতেরও সম্ভাবনা আছে ; এর ফলে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ব্যাহত হবে। প্রথমে বর্তমান শিক্ষকদেরই শিক্ষা দিয়ে যথাসম্ভব কাজে লাগানো প্রয়োজন এবং যাঁরা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় কোন কাজই করতে এবং শিখতে পারবেন না তাঁদের ধীরে ধীরে অপসারিত করা দরকার।

শিক্ষণ-শিক্ষা ঃ

বর্তমান শিক্ষণ-শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি ঃ

বুনিয়াদী শিক্ষার সার্থকতার জন্য অতি সাবধানে যোগ্য শিক্ষক নির্বাচন করা একান্ত প্রয়োজন, একথা আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষকেরা শিক্ষা লাভ করেন শিক্ষণকেন্দ্রে ; এখানেই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে এবং শিক্ষাদানের অভ্যাস আরম্ভ হয়। এজন্য শিক্ষকের উপর শিক্ষণকেন্দ্রের প্রভাব খুবই বেশী থাকে। এই প্রভাব যদি শিক্ষার্থীর শিক্ষকোচিত সদভ্যাস গঠনের পক্ষে যথেষ্ট না হয় তবে বুনিয়াদী শিক্ষার সাফল্য আশা করা যায় না। এজন্য বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের ব্যাপারে শিক্ষণ-শিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য যে সব শিক্ষণকেন্দ্র আছে তার মধ্যে বাণীপুরের শিক্ষণ-শিক্ষাকেন্দ্র ছাড়া অন্য সবগুলিই রূপান্তরিত গুরু ট্রেনিং বিদ্যালয়। এই শিক্ষণকেন্দ্রগুলি সহর কিংবা আধাসহর অঞ্চলে অবস্থিত। সহরের বর্তমান পরিবেশ বুনিয়াদী শিক্ষার পক্ষে অনুকূল নয়। বুনিয়াদী

শিক্ষা যে শোষণপ্রধান কেন্দ্রীভূত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করতে চায় তার প্রধান শক্তিকেন্দ্র হচ্ছে এই সহরগুলি। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে বসে তার রূপান্তর সাধনের চেষ্টা করা শক্তিমানের কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু এটা শক্তি সঞ্চয়ের উপায় নয়; আর শক্তি সঞ্চয়ের আগে বীরত্ব দেখাতে যাওয়াকে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নিশ্চয়ই বলা চলে না। গান্ধীজী প্রধানতঃ এই কারণেই প্রথমে পল্লী-অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বুনিয়াদী শিক্ষাকে গড়ে তোলার উপদেশ দিয়েছিলেন।

বর্তমান সরকারী শিক্ষণ-শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে কোথাও ভাল বুনিয়াদী বিদ্যালয় গড়ে ওঠেনি। স্বাভাবিকভাবেই সহরাঞ্চলের লোকেরা তাঁদের ছেলেমেয়েরা 'ছোট লোকের' মত কাজ করবে—ঘর ঝাঁট দেবে, মাটি কোপাবে, সূতা কাটবে—এটা পছন্দ করেন না। ফলে প্রধানতঃ নাচ গান ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে আর—একগাদা আবর্জনার উপর একটু গঙ্গাজলের ছিটে দেওয়ার মত—একটু আধটু দায়সারা গোছের উৎপাদনাত্মক কাজের ব্যবস্থা করে এই শিক্ষাকেন্দ্রগুলির সংলগ্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি চলছে। তাছাড়া, ব্যবস্থার ত্রুটিও রয়েছে। এইসব শিক্ষাকেন্দ্রে সাধারণতঃ তিন কিংবা চারজন অধ্যাপক থাকেন। এঁদের শিক্ষণ-শিক্ষাদানের কাজও করতে হয় আবার শিক্ষণকেন্দ্র সংলগ্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজও করতে হয়। চারজন অধ্যাপকের পক্ষে শিক্ষাদানের কাজ করে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শ্রেণীগুলিকে সুপরিচালিত করা কতখানি সম্ভব তা সহজেই অনুমেয়। এঁরা যদি প্রধানতঃ বুনিয়াদী বিদ্যালয়টিকেই ভাল করে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করতেন এবং এঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা আদর্শ বিদ্যালয় দেখে যদি শিক্ষার্থী-

শিক্ষকরা শিক্ষালাভ করতেন তবে হয়তো ফল ভালই হত। কিন্তু এসব শিক্ষণকেন্দ্রের অধ্যাপকরা শিক্ষকদের শিক্ষকতা করার শিক্ষাই পেয়েছেন, নেশায় এবং পেশায় এঁরা শিক্ষকদেরই শিক্ষক। ফলে শিশুদের নিয়ে কাজ করায় এঁদের অভিজ্ঞতা স্বল্প বলে এঁদের দ্বারা খুব ভাল বুনিয়াদী বিদ্যালয় গড়ে উঠতে পারে না। স্বাভাবিক-ভাবেই এঁরা শিক্ষণকেন্দ্রের প্রতি যথাসাধ্য মনোযোগ দেন আর বিদ্যালয় অংশটি অবহেলিতই পড়ে থাকে। এক বছরের মধ্যে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের জ্ঞানের ভাণ্ডার মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাদানপদ্ধতি, বুনিয়াদী শিক্ষার তত্ত্ব ও তথ্য এবং শিক্ষার উপাদান দিয়ে ভরে দিতে হলে অবশ্য এ ছাড়া উপায়ও থাকে না; তদুপরি পঞ্চাশ থেকে একশ' সোয়াশ' লোকের দৈনন্দিন রান্নাখাওয়া ও তার হিসাবপত্রাদি রাখার বিরাট হাঙ্গামা তো আছেই।

আমরা তত্ত্বকথা দিয়ে যতই ব্যাখ্যা করি না কেন, শিক্ষার্থীরা আসলে শেখে উদাহরণ দেখে। এই শিক্ষণকেন্দ্রগুলির সংলগ্ন বিদ্যালয়গুলি দেখেই শিক্ষার্থী-শিক্ষকেরা নিজ নিজ ধারণা গড়ে তোলেন। তার ফলে এঁরা যখন গ্রামে গিয়ে নিজেরা বিদ্যালয় গড়েন তখনও শিক্ষণকেন্দ্রের দেখে আসা নমুনা থেকে বেশী দূরে এগুতে পারেন না, এবং চেষ্টা করে এগোবার যে কোন প্রয়োজন বা সম্ভাবনা আছে তাও অনেক সময় উপলব্ধি করেন না। তাছাড়া, এই রকম শিক্ষণকেন্দ্রগুলির আর একটা প্রধান অসুবিধা হচ্ছে এই যে সহরাঞ্চলে অবস্থিত বলে এই কেন্দ্রগুলির সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ গ্রামের পরিবেশের চাইতে অনেকখানি আলাদা। ফলে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের গ্রামে গিয়ে যে কাজগুলিকে কেন্দ্র করে

শিক্ষাসংগঠন সবচাইতে বেশী করতে হবে সেগুলি সম্পর্কে তাঁরা শিক্ষণকেন্দ্রে যথেষ্ট প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন না। সর্বোপরি চল্লিশ-পঞ্চাশজন শিক্ষার্থী-শিক্ষক একটি বিদ্যালয়ের উপর শিক্ষাদানের যে মহড়া দেন তাতে শিক্ষাদানপদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞান অল্পই হয়, অপর পক্ষে বিদ্যালয়ের কার্যসূচীর ওলট পালট ও শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের কৃতিত্ব প্রদর্শনের কসরৎ এত বেশী হয় যে এই একটি কারণেই শিক্ষণ-শিক্ষাকেন্দ্রের সংলগ্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান অনেকটা নেমে যায়। এজন্য বর্তমান ব্যবস্থায় শিক্ষার দিক দিয়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের এবং শিক্ষণকেন্দ্রের সংলগ্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উভয়েরই প্রচুর ক্ষতি হয়। এরকম শিক্ষণকেন্দ্রগুলির অবস্থান ও সংগঠন যত শীঘ্র পরিবর্তন করা হয় ততই ভাল।

বর্তমান ব্যবস্থায় শিক্ষণশিক্ষালয়গুলি কেন্দ্রীভূত শিক্ষালয়। এসব শিক্ষালয়ে প্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে শিক্ষার্থীরা এসে জোটেন আবার প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে কাজে নিযুক্ত হন। বলা হয়ে থাকে যে আজ কাল বুনিয়াদী শিক্ষকদের শিক্ষা দেবার মত যোগ্য লোক খুব বেশী নেই ; তাই সমগ্র প্রদেশের লোকদের কয়েকটি কেন্দ্রে জড় করা হয় এবং প্রদেশের ভাবী বুনিয়াদী শিক্ষকরা যাতে এঁদের কাছে শিক্ষা পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষার দিক দিয়ে এই যুক্তির সারবত্তা আমরা পরে বিচার করব ; প্রথমে এই ব্যবস্থার ফলে যে কতকগুলি সাধারণ অসুবিধার সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

প্রথমতঃ শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের অবস্থাটা আমাদের হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীভূত শিক্ষণব্যবস্থার ফলে শিক্ষকদের

স্বগৃহ থেকে বহুদূরে এসে শিক্ষালাভ করতে হয়। ত্রিশটাকা মাইনের একজন শিক্ষকের পক্ষে বাড়ী ছেড়ে দূরে এসে এক বছর নিশ্চিন্তমনে শিক্ষালাভ করা কতটা সম্ভবপর তা ভেবে দেখা দরকার। বর্তমানে প্রাথমিক-শিক্ষকরা যে মাইনে পেয়ে থাকেন তাতে পরিবার প্রতিপালন করে বেঁচে থাকা অসম্ভব। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশকেই নির্ভর করতে হয় বাড়ীর জমিজমার উপর। ছাত্র পড়িয়ে কেউ কেউ কিছু আয়ের সংস্থান করেন বটে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে সর্বত্র ছাত্র জোটা কঠিন; আর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজ ভালভাবে করতে হলে ছাত্র পড়ানোর সময় পাওয়া সম্ভব নয়। এই শিক্ষকদের যদি স্বগ্রাম ছেড়ে শিক্ষালাভের জন্য বহুদূর সহরে এসে দীর্ঘকাল বসবাস করতে হয় তবে তাঁদের পারিবারিক দুরবস্থা চরমে এসে পৌঁছে। এই অবস্থায় নিবিষ্টচিত্তে শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। এজন্য শিক্ষণ-শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা এঁদের প্রায়ই পাই না। যাঁদের পাওয়া যায় তাঁরাও যথেষ্ট উৎসাহ ও একাগ্রতা নিয়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারেন না। অথচ প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের জন্য এঁদের সর্বাগ্রে শিক্ষালাভ করাটা কেন একান্ত প্রয়োজন তা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রীভূত শিক্ষণব্যবস্থার ফলে শিক্ষার্থী নির্বাচন অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। বেকারত্বের চাপে শিক্ষণ-শিক্ষা লাভের জন্য আবেদনকারীর অভাব হয় না। গ্রামের সঙ্গে কোন পরিচয়, গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে কোন যোগাযোগ, গ্রামের প্রতি কোন শ্রদ্ধা বা আত্মীয়তা বোধ না থাকা সত্ত্বেও গ্রামে গিয়ে শিক্ষকতা করার জন্য শিক্ষালাভের সুযোগ পাবার আশায় অনেকে আবেদন

করেন কেবল অর্থনৈতিক চাপে পড়ে; এমন কি অনেকের পক্ষে একবছর শিক্ষণকেন্দ্রে মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি পাবেন, অন্ততঃ ঐ সময়টুকু বেঁচে থাকার মত একটা ব্যবস্থা হবে, এইটেই তাঁদের আবেদন করার প্রধান কারণ হয়ে ওঠে। আবেদনের এই আবর্জনা-স্তূপ থেকে যোগ্য শিক্ষার্থীদের বেছে বের করা একটি দুরূহ ব্যাপার। আমাদের দেশে প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ বেকারের সংখ্যা নেহাত কম নয়; আর এই অভাগা দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করা লোক মানেই তাঁরা যাঁরা শরীরশ্রমকে ঘৃণা করার শিক্ষা পেয়েছেন। চাষীর ঘরের ছেলে পরীক্ষা পাশ করে চাষকে ঘৃণা করতে শেখে। স্যাকরার ছেলে লেখাপড়া শিখে তার স্বভাবজ শিল্পনিপুণতা হারিয়ে ফেলে। অথচ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কোন শিল্প-কাজকে কেন্দ্র করে শিক্ষা দিতে হলে এ সব নিপুণতার প্রয়োজন সমধিক। ম্যাট্রিক পাশ কেরাণী জোটে অনেক, কিন্তু এরকম কর্মীর, শিল্পীর বড়ই অভাব। তদুপরি শিক্ষণকেন্দ্রে ভর্তি করার জন্য আজকাল যেরকম পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে তাতে শিক্ষার্থীর গ্রামের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ, শরীর মনের যোগ্যতা গ্রামের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার শক্তি ইত্যাদির বিচার করা খুব কমই সম্ভব হয়; অথচ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের একজন ভাবী শিক্ষকের পক্ষে লেখাপড়ার যোগ্যতার চাইতে এই যোগ্যতাগুলির মূল্য কোন অংশেই কম নয়। ফলে বহু শিক্ষার্থী-শিক্ষকের পিছনে শিক্ষণ-শিক্ষার ব্যয় অপব্যয়ই মাত্র হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয়তঃ বর্তমান শিক্ষণব্যবস্থায় সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষক নির্বাচন ও তাঁদের যথাযোগ্যভাবে কাজে লাগানো সম্ভব নয়।

ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি যে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কেবলমাত্র ব্যক্তিগতভাবে ভাল শিক্ষক হলেই চলবে না তাঁদের একটি সুসম্বদ্ধ সুসম্পূর্ণ দল তৈরী করতে হবে। একটা ক্রিকেট দলে যেমন ১১ জন ভাল ব্যাটস্‌ম্যান্ বা একটা ফুটবল দলে যেমন ৫ জন দুর্ধর্ষ সেণ্টার ফরওয়ার্ড থাকলেই দলটি ভাল হয়ে যায় না, তেমনি একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ৫ কিংবা ৮ জন ভাল শিক্ষক হলেই চলবে না ; তাঁরা পরস্পরের পরিপূরক কিনা এবং তাঁরা সকলে মিলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে করণীয় বিচিত্র কাজগুলি সম্পন্ন করতে পারবেন কিনা তা দেখা চাই। এজন্য কতগুলি বিদ্যালয় সংগঠন করা হবে, তাতে কি কি যোগ্যতাসম্পন্ন কতজন শিক্ষকের প্রয়োজন হবে, তা প্রথমে ঠিক করে উপযুক্ত শিক্ষার্থী-শিক্ষককে শিক্ষণ-শিক্ষাকেন্দ্রে গ্রহণ করা প্রয়োজন। পাইকারী হারে শিক্ষণব্যবস্থা করতে হলে সমগ্র প্রদেশের জন্য নিখুঁত এবং বিশদ পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তা না হলে বিরাট অপচয় অবশ্যম্ভাবী। বিভিন্ন শিক্ষণ-কেন্দ্রে বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ ও কর্মপন্থা নিয়ে বর্তমানে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। ফলে বিভিন্ন শিক্ষণকেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকরা এক বিদ্যালয়ে কাজ করতে গিয়ে অবাঞ্ছিত ও নিরর্থক জটিলতার সৃষ্টি করেন। এ ক্ষেত্রে একই শিক্ষণকেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরই একটি বিদ্যালয়ে নিয়োগ করা যুক্তিযুক্ত। বিভিন্ন শিক্ষণকেন্দ্রে বিভিন্ন নির্দিষ্ট এলাকার শিক্ষকদের শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করা উচিত। এর ফলে বিভিন্ন শিক্ষণকেন্দ্রের শিক্ষণ-পদ্ধতির প্রভাব ও উৎকর্ষ ভালভাবে পরীক্ষা করার সুযোগ পাওয়া যাবে। এসকল ক্ষেত্রেও বিভিন্ন এলাকার জন্য প্রথমেই বিশদ পরিকল্পনা রচনা করা দরকার।

আমাদের দেশে এরকম সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা ও শিক্ষাদান-ব্যবস্থা নেই। কোন্ কোন্ বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত করা হবে বা কোথায় নতুন বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে তা স্থির করেন স্কুলবোর্ড ; শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন সরকার। অনেক সময় নিজ নিজ এলাকা থেকে শিক্ষার্থী-শিক্ষক নির্বাচন করে পাঠান জেলা স্কুলবোর্ড ; তাঁদের বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কোন্ ধরণের কতজন শিক্ষক প্রয়োজন হবে সে সম্পর্কে কোন ধারণা থাকে না। আবার শিক্ষণ-কেন্দ্রে যাঁরা শিক্ষা দেন তাঁরা জানেন না : (ক) শিক্ষার্থী-শিক্ষকরা কোথায় গিয়ে কিভাবে কাজ করবেন, (খ) কোন্ কোন্ বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত করা হবে এবং সেখানে কোন্ যোগ্যতা-সম্পন্ন শিক্ষকের আশু প্রয়োজন, (গ) বর্তমানে যে সকল শিক্ষক আছেন তাঁরা কোন্ কাজ করতে পারেন এবং তাঁদের পরিপূরক হতে হলে শিক্ষার্থী-শিক্ষককে কোন্ বিশেষ শিক্ষা দিতে হবে, (ঘ) যেখানে বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানকার পরিবেশ ও সমস্যা কিরকম, (ঙ) স্থানটি ও তার আশপাশের বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে সমগ্র অঞ্চলে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রভাব প্রতিষ্ঠা করা কতদূর সহজসাধ্য হবে। এ বিষয়গুলি হয়তো আদৌ বিচার করা হয় না ; ফলে সমগ্র শিক্ষণ-ব্যবস্থাটা শূন্যে সৌধনির্মাণের মত হয়ে পড়ে। বহু ব্যয় করে যে বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় তাতে বুনিয়াদী শিক্ষার কার্যসূচী অনুসরণ করতে গিয়ে প্রাণান্ত হতে হয়। অনুপযুক্ত পরিবেশ কাজের প্রকাণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বহু অর্থব্যয়ে যে শিক্ষককে শিক্ষণ-শিক্ষা দেওয়া হয় তিনি হয়তো কাজ করার কোন সুযোগই পান না। সর্বোপরি অধিকাংশ ক্ষেত্রে

শিক্ষকরা পরস্পরের পরিপূরক না হওয়ায় তাঁদের নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিটাই প্রবল হয়ে ওঠে। অপরপক্ষে শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক নিয়োগ একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। পূর্বাহ্নেই বিস্তারিত পরিকল্পনা না থাকায় শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের স্বগ্রাম থেকে বহুদূরে নূতন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে গিয়ে কাজ করতে হয়। বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষকের পক্ষে বাড়ী ছেড়ে বহুদূরে গিয়ে শিক্ষকতা করা প্রায়ই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান অবস্থার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, অনেক শিক্ষক শুধু এই কারণেই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের চাকুরী প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছেন অথবা কাজ গ্রহণ করেও মনস্থির করতে, কাজ করতে পারছেন না। তাছাড়া, কি কি যোগ্যতাসম্পন্ন কতজন শিক্ষক কোথায় দরকার সে সম্পর্কেও পূর্ব-পরিকল্পনা না থাকায় নিয়োগের জন্য বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক খুঁজতে গিয়ে শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় শিক্ষক খুঁজে পাওয়া যায় না।

সংগঠনের দিক থেকে এসকল ত্রুটি ছাড়া নিছক শিক্ষার দিক থেকেও কতকগুলি মারাত্মক ত্রুটি বর্তমান ব্যবস্থায় থেকে যায়। প্রথমতঃ একবছরের যে শিক্ষাকাল বর্তমানে শিক্ষণ-শিক্ষা লাভের জন্য নির্দিষ্ট রাখা হয় সেই সময়ের অধিকাংশ বুনিয়াদী শিক্ষা যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও নূতন জীবনযাত্রাপ্রণালী দাবী করে তাতে রপ্ত হতে হতেই কেটে যায়। জীবনকে নূতন করে ঢেলে গড়া, বর্তমান সভ্যতার মাপকাঠি পরিত্যাগ করে জীবন ও সভ্যতাকে নূতন মাপকাঠি দিয়ে বিচার করতে শেখা, এ হচ্ছে বুনিয়াদী শিক্ষা লাভের প্রথম সোপান। বুনিয়াদী শিক্ষা কেবলমাত্র তত্ত্ব ও তথ্য মুখস্থ

করার শিক্ষা নয়—জীবন গড়ার শিক্ষা। এ শিক্ষা শিক্ষককে ছাত্রের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে বক্তৃতা দিয়ে নয়, ছাত্রের সামনে নিজের জীবনকে আদর্শরূপে প্রসারিত করে। সুতরাং বুনিয়াদী শিক্ষণকেন্দ্রে শিক্ষার্থী-শিক্ষককে অনেকগুলি খুঁটিনাটি অভ্যাস গঠন করতে হয়। কিন্তু এ করতে গিয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা এবং শিক্ষাদানের উপকরণ সংগ্রহ ও তৈরী করা অনেকটা ব্যাহত হয়। আজকালকার ম্যাট্রিক পাশ বিদ্যার্থীর জ্ঞান পাঠ্য-পুস্তকের কতকগুলি সংবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম এবং খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অতি অল্পই থাকে। সুতরাং কাজকে কেন্দ্র করে শিক্ষা দিতে গেলে যে বিষয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন তাও তাদের অতি সীমাবদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বাংলার সাধারণ গ্রাম্য-গীতি বা তার ইতিহাস, তুলার গঠন, সুতার আমদানী রপ্তানী, বিভিন্ন দেশের বস্ত্রবয়ন ইত্যাদি সম্পর্কে কোন সংবাদ প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকে আমরা কোথাও পাই না। আমরা ইতিহাস ভূগোল পড়ি কিন্তু গ্রামকে চিনি না। অঙ্ক করি কিন্তু হিসাব করে কাজ করি না। বিজ্ঞান পড়ি কিন্তু জীবনে বিজ্ঞানের নিত্য প্রয়োগ সম্পর্কে একান্ত অজ্ঞ থাকি। এক বছরের মধ্যে পুস্তকের সহায়তা ব্যতীত এসকল বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য যে প্রস্তুতি প্রয়োজন তা পাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া, বিদ্যালয়ের কাজে যোগদানের আগে শিক্ষাদানের জন্য যেসকল উপকরণ তৈরী কিংবা সংগ্রহ করে নেওয়া দরকার তাও এই ব্যবস্থায় করা সম্ভব হয় না। এর পর তিনি যখন বিদ্যালয়ের কাজের ভার নিয়ে গ্রামে গিয়ে বসেন তখন

তার কাছে উপযুক্ত গ্রন্থাগার, যথেষ্ট সরঞ্জাম এবং যোগ্য পথপ্রদর্শক কোনটাই থাকে না। এক বছর শিক্ষণ-শিক্ষা পাওয়ার ফলে কোন শিক্ষক বর্তমান শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলিকে নূতন শিক্ষাদানপদ্ধতির উপযোগী করে ঢেলে সেজে নেবার শক্তি অর্জন করবেন, এ আমরা আশা করতে পারি না ; কিন্তু বর্তমান শিক্ষণ ব্যবস্থায় যাঁরা সহায়তা করতে পারেন তাঁরা থাকেন বহুদূরে। ফলে শিক্ষার্থী অনেক হাবুডুবু খেয়ে যা হক একটা কিছু খাড়া করে তোলেন। এই গোঁজা-মিলকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদৌ বুনিয়াদী শিক্ষা বলা চলে না। এতে না হয় শিক্ষকের কোন উপকার, না বিদ্যার্থী এ থেকে কোন উপকার লাভ করে ; অথচ এই বিকৃত বুনিয়াদী শিক্ষা দেখেই জনসাধারণ বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে বিচার করেন। ফলে যথেষ্ট অর্থব্যয় করে যে বুনিয়াদী শিক্ষার পত্তন করা হয়, তা বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি জনসাধারণকে বিরূপই করে তোলে মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে শিক্ষণ-শিক্ষার যে কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা রয়েছে তাতে শিক্ষণ-শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী-শিক্ষকের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ গড়ে ওঠা খুব কঠিন। বুনিয়াদী শিক্ষায় এই ব্যক্তিগত যোগাযোগ একান্ত প্রয়োজন। যেখানে বইএর পড়া মুখস্থ করানই প্রধান লক্ষ্য, সেখানে ব্যক্তিগত যোগাযোগ কম হলেও ততটা ক্ষতি হয় না ; কিন্তু ছাত্রের জীবন গড়ে তুলতে হলে তার সঙ্গে শিক্ষকের নিবিড় সম্পর্কের প্রয়োজন। এই ঘনিষ্ঠতার অভাবে ছাত্র যা শিখে থাকে, তাকে জীবনের ধর্মরূপে গ্রহণ করতে পারে না। ভবিষ্যতে এই শিক্ষার্থী শিক্ষকরা তাদের ছাত্রদেরও শুধু উপদেশামৃতই পরিবেশন করতে অভ্যস্ত হয়। এর ফলে জীবন ও উপদেশ, কথা

ও কাজের মধ্যে যে অসামঞ্জস্য থেকে যায় তা বুনিয়াদী শিক্ষার সার্থকতার একান্ত পরিপন্থী।

শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ কর্মকেন্দ্রীক শিক্ষার উৎকর্ষের জন্য অপরিহার্য। প্রত্যেক শিক্ষাথীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তার বিশেষ ত্রুটিগুলি দূর করা দরকার। প্রকাণ্ড শ্রেণী নিয়ে কাজ করতে হলে এ ব্যবস্থা কিছুতেই সম্ভব হয় না। ফলে ব্যক্তিগত ত্রুটিগুলি থেকেই যায়, অথচ শ্রেণীর পাঠ্যক্রম শেষ হয়ে চলে। এই শিক্ষকরা যখন নিজেদের বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন তখন তাঁদের শিক্ষাদান অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ হয়, অথচ তখন ত্রুটিগুলি দূর করার কোন উপায়ও থাকে না।

ব্যক্তিগত যোগাযোগ কাজের আরম্ভে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষকদের উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং প্রেরণাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যও দরকার। শিক্ষণকেন্দ্রে ছাত্রশিক্ষকে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠলে এই একান্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা চাওয়া ও দেওয়া দুইই সহজ হয়। এক-একটি ছাত্র যেখানে একটা প্রকাণ্ড দলের এক-একটি অংশমাত্র সেখানে এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। ফলে শিক্ষাথী-শিক্ষক যখন গ্রামে গিয়ে কাজ আরম্ভ করেন তখন তিনি তার ব্যথা, বেদনা, সমস্যা ইত্যাদি জানাতে সঙ্কোচ বোধ করেন। অপর পক্ষে এরকম ক্ষেত্রে সহায়তা চেয়ে পাঠালেও শিক্ষণকেন্দ্রের শিক্ষকদের পক্ষে কোন সহায়তা দেওয়া কঠিন হয়, কারণ তাঁদের পক্ষে ছাত্রের দোষ গুণ মনে করে রাখা কঠিন এবং ছাত্রের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় না থাকলে ঠিক কি কারণে ছাত্রের

পক্ষে সফলতা অর্জন সম্ভব হচ্ছে না তা বিশ্লেষণ করে উপদেশ দেওয়াও সম্ভব হয় না।

তৃতীয়তঃ একটি বৃহৎ শিক্ষণকেন্দ্রের পরিবেশ একান্ত অবাস্তব পরিবেশ। গ্রামের মধ্যে স্থাপিত হলেই একটি শিক্ষণকেন্দ্রে শিক্ষার্থী-দের সঙ্গে গ্রামের প্রকৃত পরিবেশের পরিচয় ঘটবে তা আশা করা উচিত নয়। অনেক বুদ্ধিজীবী এক-একটি শিক্ষণকেন্দ্রে এসে জড় হন। প্রকৃত পক্ষে এঁদের পরিবারবর্গ এবং শিক্ষার্থীদের নিয়েই এরকম কেন্দ্রের পরিবেশ গড়ে ওঠে। ফলে সেখানে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় তা ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামের সত্যকার পরিবেশের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। এরকম কেন্দ্রের আদর্শ বিদ্যালয়ে যে ছাত্রছাত্রী পাওয়া যায় তাহা প্রধানতঃ এইসকল বুদ্ধিজীবীদেরই পুত্র কন্যা। এঁদের নিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী-শিক্ষকরা শিক্ষার মান বা অন্যান্য বিষয়ে যে ছবি দেখতে পান, এদের নিয়ে যেসব সমস্যা বিদ্যালয়ে দেখা দেয় তাও প্রকৃত গ্রামের বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বা সমস্যার সঙ্গে এক নয়।

কিন্তু এইরকম পরিবেশের সবচেয়ে মারাত্মক ত্রুটি হচ্ছে গ্রামের সঙ্গে এসব উপনিবেশের অন্তর্দ্বন্দ্ব। গ্রামের লোকেরা এসব কেন্দ্রের লোকদের আপন করে নিতে পারেন না, অপর পক্ষে এসব কেন্দ্রের লোকেরাও গ্রামের সঙ্গে দয়া দাক্ষিণ্য এবং মুরুব্বিয়ানার সম্পর্কই পাতাতে চান। ফলে পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস বেড়ে উঠতে থাকে। গ্রাম এবং শিক্ষণকেন্দ্রকে কেন্দ্র করে যে উপনিবেশ গড়ে ওঠে এদের জীবনযাত্রা ও স্বার্থ এত পরস্পরবিরোধী যে এই দুই পরস্পরবিরোধী স্রোত পাশাপাশি বইতে থাকলে গ্রামজীবনে যে

আবর্তের সৃষ্টি হয় তাতে শুধু হলাহলই বেরিয়ে আসে। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষণ-কেন্দ্রের সঙ্গে পরিবেশের প্রকৃত পক্ষে কোন যোগাযোগই থাকে না অথচ যোগাযোগের একটা ভান থাকে, এইটেই এর সবচাইতে মারাত্মক বিপদ।

চতুর্থতঃ এরকম কেন্দ্রীভূত শিক্ষণ-শিক্ষালয়ে অনেক বিশিষ্ট শিক্ষাকর্মী একত্রিত হন কিন্তু তাঁদের পরিপূর্ণ বিকাশের কোন সুযোগ দেওয়া এই ব্যবস্থায় সম্ভব হয় না। এঁদের উপর যথেষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করা বা এঁদের কাছ থেকে পুরা কাজ আদায় করা কোনটাই এই ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। এর ফলে প্রচুর জাতীয় শক্তি ও মনীষার অপচয় ঘটে। শিক্ষাকর্মীরা রুটিন অনুযায়ী কাজটুকু সেরেই মুক্তি পান অথবা নিশ্চুপ হয়ে থাকতে বাধ্য হন। এর ফলে তাঁদের মধ্যে আসে হয় জড়ত্ব অথবা অস্থিরতা। যাঁরা প্রাণপণে কাজ করতে চান, রুটিনের কাজটুকু সেরেই যাঁরা দায়িত্ব সমাধা করতে চান না, তাঁদের শক্তি সামর্থ্যকে পুরোপুরি কাজে লাগাবার সুযোগ কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থায় অল্পই পাওয়া যায়।

পঞ্চমতঃ এই ব্যবস্থায় শিক্ষক অথবা শিক্ষার্থী কারও কাজের উৎকর্ষ বিচার করা সম্ভব নয়। শিক্ষকদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা নিজের বিভাগের অভাব অসুবিধার লম্বা তালিকা সর্বদাই খাড়া করতে পারেন, কার্যসূচীতে তাঁর বিশেষ বিষয়ের প্রতি ঔদাসীন্যের দিকে সর্বদাই অঙ্গুলী নির্দেশ করতে পারেন। এরকম প্রকাণ্ড যজ্ঞের ব্যাপারে কার্যসূচী তৈরী করা এবং প্রত্যেকের প্রতি সুবিচার করা যে কত কঠিন ব্যাপার তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পরিমাপ করা এই ব্যবস্থায় প্রায় অসম্ভব বলেই

আমার মনে হয়। ভবিষ্যতে যাঁরা শিক্ষকতা করবেন তাঁদের শিক্ষাদান-ক্ষমতার পরীক্ষার ব্যবস্থা করাই শিক্ষণকেন্দ্রের পরীক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু এরকম কেন্দ্রীভূত শিক্ষণকেন্দ্রে শিক্ষার্থী-শিক্ষকরা মাত্র কয়েক ঘণ্টার বেশী শিক্ষাদানের সুযোগ পেতে পারেন না। এই কয়েক ঘণ্টার শিক্ষাদানের কোন ছাপ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর পড়ে না—যদি বা কিছু পড়ে তা অন্যান্য শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের প্রচেষ্টার দাপটে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যায়। সুতরাং শিক্ষকদের এই শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের যোগ্যতার পরিমাণ করতে বাধ্য হতে হয় বইয়ে পড়া কতগুলি গৎবাঁধা নিয়ম কানুনের উপর নির্ভর করে। শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের কাজের কোন বাস্তব ফলাফলের বিচার করা সম্ভব হয় না। পরীক্ষার লক্ষ্য তাই প্রধানতঃ হয়ে ওঠে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের তত্ত্ব ও ও তথ্যের ঝুলির ওজন পরীক্ষা করা। নানা কারণেই ভাবী শিক্ষকদের প্রধানতঃ এদিক দিয়ে বিচার করা সন্তোষজনক হতে পারে না। এর ফলে প্রায়ই শিক্ষকতার ক্ষেত্রে অনেক পণ্ডিতমূর্খের সাক্ষাৎ পেয়ে থাকি—যাঁদের জ্ঞানের বোঝা নেহাত হালকা নয়; কিন্তু নিজের জ্ঞান, জ্ঞানস্পৃহা, প্রচেষ্টা ও উদ্দীপনা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চালিত করার কলাকৌশল যাঁদের একেবারেই অজানা। এ অবস্থা বাঞ্ছনীয় নয়।

শিক্ষণ-শিক্ষার একটি পরিকল্পনা :

বর্তমান অবস্থার ত্রুটিগুলি দূর করার জন্য ও বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতিষ্ঠাকে সহজ ও সার্থক করার জন্য নিম্নলিখিত পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করা সম্ভব বলে মনে করি।

(১) সর্বপ্রথমে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বিদ্যালয়ের পরিবর্তে একটি অঞ্চলকে বেছে নিতে হবে। এই অঞ্চলে অনধিক ১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকবে। এই এলাকার মধ্যে ৫০টির বেশী গ্রাম যেন না থাকে।

(২) এই এলাকার কেন্দ্রস্থলে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বেছে নিতে হবে। এই বিদ্যালয়টি এমন একটি গ্রামে অবস্থিত হওয়া চাই যেখানে যাতায়াতের ভাল পথ আছে, যেখানে বৎসরের যে কোন সময়েই সহজে যাতায়াত করা যেতে পারে, যেখানকার দূরত্ব পূর্বোক্ত অঞ্চলের যে কোন বিদ্যালয় থেকে হাঁটাপথে ৪।৫ মাইলের বেশী নয়। এই বিদ্যালয়ের অন্ততঃ তিন একর জমি থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় জমি না থাকলে এবং অন্যান্য সব দিক থেকে বাঞ্ছনীয় মনে হলে সরকারকে এরকম বিদ্যালয়ের জন্য জমি দখল করে দিতে হবে।

(৩) উপরোক্ত বিদ্যালয়টিকে সর্বপ্রথমে অঞ্চলের কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়রূপে গড়ে তুলতে হবে। প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ও ক্রমশঃ একে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত করতে হবে। প্রত্যেক কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে যাতে উত্তর বুনিয়াদী বিভাগ খোলার সুযোগ থাকে সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। নিম্ন বুনিয়াদী ও উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের জন্য কোন্ কোন্ যোগ্যতাসম্পন্ন কতজন শিক্ষকের প্রয়োজন হবে তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের অঙ্গরূপে একটি সরঞ্জামালয়, একটি কেন্দ্রীয় পাঠাগার ও একটি কেন্দ্রীয় সংগ্রহাগার থাকবে। এগুলি পূর্বোক্ত

সমগ্র এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে সরঞ্জাম ও পুস্তক জোগাবে। কেন্দ্রীয় সংগ্রহাগারে এলাকার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বেড়াতে আসবে এবং এলাকার বিদ্যালয়গুলির প্রদর্শনীতে কেন্দ্রীয় সংগ্রহাগার থেকে সর্বপ্রকার সহায়তা ও সহযোগিতা করা হবে।

(৪) কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় সাধারণ শিক্ষক ছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষণ-শিক্ষায় বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন শিক্ষাকর্মী এবং একজন কৃষি-সহকারী থাকবেন। এই শিক্ষাকর্মীর উপর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় পরিচালনা এবং সমগ্র এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরীকরণের দায়িত্ব থাকবে। কৃষিকর্মীর উপর দায়িত্ব থাকবে বিদ্যালয়ের জমি যাতে আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হয় তা দেখার। কৃষির আয় থেকেই ৫ বৎসরের মধ্যে তাঁর বৃত্তির সংস্থান হওয়া চাই। তাঁর আর একটি কাজ হবে অঞ্চলের অন্তর্গত বিদ্যালয়গুলির জমি যাতে একটুও অনাবাদী পড়ে না থাকে তা দেখা। তাঁর পরামর্শ অনুসারে ঐসব বিদ্যালয়ের জমিতে চাষ আবাদের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষাকর্মীর প্রথম কাজ হবে ১৪টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণ-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। এছাড়া তিনি অন্ততঃ দুইজন উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করবেন যাঁরা শিক্ষালাভের পর অন্যত্র গিয়ে এরকম অঞ্চলের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন। এঁদের শিক্ষাকাল হবে দুই বৎসর।

শিক্ষাকর্মী প্রথমে অঞ্চলের প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে গিয়ে প্রকৃত অবস্থা দেখবেন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করবেন। যে শিক্ষকরা বর্তমানে রয়েছেন

তাঁদের দিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষার কোন্ কাজ কতখানি হতে পারে তা নির্ণয় করা হবে তাঁর প্রথম কর্তব্য। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রামে গ্রামে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে এবং বিভিন্ন গ্রাম থেকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের জন্য অন্যূন ৬ বিঘা জমি সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজন হলে সরকার প্রত্যেকটি রূপান্তরিত বিদ্যালয়ের জন্য ৬ বিঘা জমি দখল করে দেবেন।

কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে একসঙ্গে ১৫ থেকে ২০ জন শিক্ষকের থাকার এবং তাঁদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে। অঞ্চলের অন্তর্গত প্রত্যেক বিদ্যালয় থেকে একজন করে শিক্ষক এসে প্রথমে ৬ মাস কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষণ-শিক্ষা গ্রহণ করবেন। তারপর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নিজের বিদ্যালয়ে ফিরে গিয়ে দেড় বছর কাজ করবেন। তারপর আবার তাঁকে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে এসে ছয় মাস শিক্ষণ-শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সমগ্র এলাকাটিকেই একটি শিক্ষণ-শিক্ষা-কেন্দ্র বলে গণ্য করা হবে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের চৌকাঠ পেরিয়ে গেলেই শিক্ষণ-শিক্ষা শেষ হয়ে গেল একথা বলা চলবে না। শিক্ষণ-শিক্ষা-কেন্দ্রের প্রথম ছয় মাসের শিক্ষাকাল শেষে যখন এঁরা নিজ নিজ বিদ্যালয়ে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করতে সুরু করবেন তখনও এঁরা শিক্ষার্থী-শিক্ষক হিসাবে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষাকর্মীর প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে কাজ করবেন। এঁদের সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন মিলিত হতে হবে এবং এঁরা নিজেদের পরিকল্পনা ও কার্যবিবরণী শিক্ষাকর্মীর নিকট দাখিল করবেন।

শিক্ষার্থী-শিক্ষকরা যে সময়টা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে থাকবেন সে সময়টা তাঁরা প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবেন। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শ্রেণী-শিক্ষকদের কাছে বিভিন্ন কাজের পাঠ নেবেন। তাঁদের এই সমগ্র কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করবেন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষাকর্মী; তিনি নিজে বিশেষভাবে বুনিয়াদী শিক্ষার তাত্ত্বিক দিকটা শিক্ষা দেবেন। বলা বাহুল্য তত্ত্বের শিক্ষা কেবল বক্তৃতার ভিতর দিয়ে হবে না, নিজের ও বিদ্যালয়ের মধ্যে তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত থেকেই শিক্ষার্থীরা প্রধানতঃ শিক্ষা গ্রহণ করবেন। নিজ নিজ বিদ্যালয়ে ফিরে গিয়ে শিক্ষার্থীরা তাঁদের এই ছয় মাসে আয়ত্ত করা শিক্ষার প্রয়োগ করবেন। বিদ্যালয়ের ঘরবাড়ী থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি জিনিষ গড়ে তোলা এঁদের কর্তব্য হবে। যে দুজন উচ্চশিক্ষিত শিক্ষার্থী-শিক্ষক কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে থাকবেন তাঁরাও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষাকর্মীর নেতৃত্বাধীনে প্রাথমিক শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের শিক্ষাদানে সহায়তা করতে পারবেন।

(৬) কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষকদের বিশেষ যত্নের সঙ্গে নির্বাচন করতে হবে। তাঁদের নিজ নিজ কাজে বিশেষ দক্ষতা থাকা চাই। প্রত্যেক অঞ্চলের অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যথাসম্ভব ঐ বিদ্যালয়ের এলাকা থেকে নির্বাচন করতে হবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের এলাকা থেকে যদি উপযুক্ত শিক্ষার্থী-শিক্ষক না পাওয়া যায় তবে সমগ্র অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থী-শিক্ষক পাবার চেষ্টা করতে হবে; তাও না পাওয়া গেলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। সর্বপ্রথমে বর্তমান শিক্ষকদের শিক্ষালাভের সুযোগ দিতে হবে। যাঁদের শিক্ষাদানের কোন যোগ্যতাই নেই, যাঁদের বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের

কোন কাজেই লাগান সম্ভব নয় তাঁদের নির্বাচিত অঞ্চলের বাইরে কোথাও নিয়োগ করতে হবে অথবা এক বৎসরের মধ্যে তাঁরা যাতে পদত্যাগ করেন তার ব্যবস্থা করতে হবে।

এই পরিকল্পনার সুবিধা ঃ

উপরোক্ত পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হলে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া সম্ভব হবে ঃ

(১) সুপরিকল্পিতভাবে প্রাথমিক শিক্ষার রূপান্তর সাধন সম্ভবপর হবে। চারিদিকে সাধারণ বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় নিতান্তই খাপছাড়া ঠেকে। কর্মবিমুখ জাতি বুনিয়াদী শিক্ষার কর্মকেন্দ্রিক কার্যসূচীকে প্রথমাবধিই বিরাগের চোখে দেখে থাকেন; ফলে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষালয়কে অহেতুক প্রবল বিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। ছাত্রদের অভিভাবকরা বুনিয়াদী শিক্ষার ফলাফল দেখার জন্য অপেক্ষা না করেই তাঁদের পুত্র কন্যাদের অন্য সাধারণ বিদ্যালয়ে পাঠাতে সুরু করেন। এর ফলে কাজের ফলাফল নির্ণয় কঠিন হয়ে পড়ে। একটা এলাকা নিয়ে কাজ সুরু করলে ছাত্রদের বিদ্যালয় পরিবর্তনের সুযোগ থাকবে না। শিক্ষকরা এর ফলে অধিকতর উৎসাহ পাবেন এবং অধিকতর আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করতে পারবেন। সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজকরার সুযোগ পাওয়ার ফলে কাজের উৎকর্ষ বেড়ে যাবে।

(২) বর্তমানে জনসাধারণের মনে বুনিয়াদী শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে দুইটা নীতি পাশাপাশি চালু থাকায় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী

বিদ্যালয়ে পরিণত করার কোন ব্যাপক ব্যবস্থা না থাকায় প্রচুর বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষাবিভাগের বিশিষ্ট কর্মচারীরাও বুনিয়াদী শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। এভাবে ব্যাপকভাবে সাধারণ বিদ্যালয়ের রূপান্তরীকরণ সুরু হলে বিভ্রান্তি দূরীকরণের সহায়তা হবে।

(৩) এই পরিকল্পনায় বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষকদের সর্বপ্রথমে সুযোগ দেবার ব্যবস্থা থাকবে। ফলে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতিষ্ঠা নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যেই যে স্বার্থ-সংঘাত আজ সুরু হয়েছে তা বিদূরিত হবে। এই সংঘাত না থাকলে প্রাথমিক শিক্ষকরা বুনিয়াদী শিক্ষার গুণাগুণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে পারবেন।

(৪) এই ব্যবস্থা গৃহীত হলে শিক্ষণ-শিক্ষা অধিকতর সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূ হবে।

(ক) এই ব্যবস্থায় শিক্ষণকেন্দ্রে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে অধিকতর যোগাযোগ স্থাপিত হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগত-ভাবে জানার এবং প্রত্যেকের ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করার প্রচুর সুযোগ শিক্ষক পেতে পারবেন। প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের পরিবেশ তিনি জানতে পারবেন এবং বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনবোধে প্রত্যক্ষভাবে কাজে সহায়তা করতে পারবেন।

(খ) প্রত্যেক শিক্ষার্থী-শিক্ষক কাজ করতে করতেও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, সরঞ্জামালয়, সংগ্রহাগার এবং শিক্ষকদের সঙ্গে পরিপূর্ণ যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবেন। ফলে শিক্ষার উপকরণ তৈরী ও সংগ্রহ করার এবং অনভিজ্ঞ অবস্থায় পথ প্রদর্শনে সহায়তা পাবার ব্যবস্থার যে অভাব আজ আছে তা দূরীভূত হবে।

(গ) শিক্ষণ-শিক্ষা-কেন্দ্রের সংলগ্ন বিদ্যালয়টি এক্ষেত্রে অনভিজ্ঞ শিক্ষকদের পরীক্ষাক্ষেত্রে পরিণত না হয়ে একটি আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত হবার সুযোগ পাবে। এই বিদ্যালয় দেখে শিক্ষার্থী শিক্ষকরা অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারবেন এবং এখানকার কার্যক্রম দেখে নিজেদের পরিকল্পনার ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করতে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শিখতে পারবেন। এর ফলে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা শিক্ষণ-শিক্ষার পরীক্ষাগারে 'গিনি পিগ' হয়ে না থেকে যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে।

(ঘ) এই ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের পরীক্ষা করা খুব সহজ হয়ে পড়বে। শিক্ষার্থী-শিক্ষকরা নিজেদের বিদ্যালয়ে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে যে কাজ করবেন তাকে ভিত্তি করেই তাঁর কাজের উৎকর্ষ বিচার করা চলবে।

(ঙ) আজকাল সরকার শিক্ষণ-শিক্ষার ক্ষেত্রে যতটা ব্যাপকভাবে কাজ করছেন তার অনুপাতে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করতে পারছেন না। এই অসামঞ্জস্যের ফলে বহু অর্থ ও সামর্থ্যের অপচয় ঘটছে। পরীক্ষোত্তীর্ণ শিক্ষার্থী-শিক্ষকরা শিক্ষণকেন্দ্র থেকে ফিরে গিয়ে শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন না। নিজেদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নূতন শিক্ষার প্রয়োগ তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেছে না। গ্রামসমাজ তাঁর কথা গ্রহণ করছেন না। সরকারও যথেষ্ট পরিমাণে বুনিয়াদী বিদ্যালয় খুলে এদের সুযোগ দিতে পারছেন না। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করলে শিক্ষণ-শিক্ষা এবং বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসারের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হবে। এর ফলে শিক্ষক নির্বাচন এবং তাঁদের নিয়োগও জটিলতা-বর্জিত এবং সুষ্ঠু হবে।

একদিকে অতিরিক্ত ব্যস্ততার জন্য অন্যদিকে যে বিরাট অপচয় ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে তা এই ব্যবস্থায় দূরীভূত হবে।

(৬) বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ শিক্ষাকর্মীরা এই ব্যবস্থার ফলে নিজেদের শক্তির পূর্ণ প্রয়োগ করার সুযোগ পারেন। শিক্ষণ-কেন্দ্রে শিক্ষকরা যখন গ্রামের সমস্যা এবং তার সমাধানের জন্য বুনিয়াদী শিক্ষক কিভাবে কাজ করতে পারেন সে সম্পর্কে কাল্পনিক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন তখন শিক্ষার্থী-শিক্ষকরা মনে মনে হেসেই থাকেন। এসব বক্তৃতা তাঁদের মনে অল্পই রেখাপাত করে, এবং এসকল বক্তৃতায় বক্তৃতাদাতারা নিজেরা কতখানি বিশ্বাস করেন তাও বলা শক্ত। শুধু তাই নয়, এই অবিশ্বাসের সঙ্গে শিক্ষাদাতার সম্পর্কে যে অশ্রদ্ধার ভাব আসে শিক্ষণকেন্দ্রের কাজকে তা অনেকখানি ব্যাহত করে। "নিশ্চিন্ত মনে মাসের পর মাস লম্বা মাইনে পেলে এরকম গালভরা বক্তৃতা দেওয়া খুব সহজ" এমন একটা ধারণা শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের মনে দানা বেঁধে ওঠে, এ আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। এ ব্যবস্থায় এই অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার সৃষ্টির সুযোগ থাকবে না। শিক্ষকদের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে এবং নিজের হাতে কাজ করে কিভাবে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং তার সমাধান করতে হয় তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজের ত্রুটি বা অক্ষমতা ঢাকবার সুযোগ যেমন তার থাকবে না, তেমনি নিজের শক্তি সামর্থ্যের সার্থক প্রয়োগের সুযোগও তাঁর জুটবে। এই নিরলস একনিষ্ঠ চেষ্টা যেমন তাঁর আত্মবিকাশকে সহজ করবে, তেমনি তাঁর শ্রদ্ধার আসন সুনিশ্চিত করে তাঁর শিক্ষাকে অধিকতর ফলপ্রসূ করে তুলবে।

(৭) সর্বোপরি এই শিক্ষা ব্যয়ের প্রশ্নের অনেকখানি সমাধান করতে পারবে ঃ

(ক) প্রথমতঃ এই ব্যবস্থায় অপচয় বন্ধ হবে। যে ব্যয় উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে সহায়তা করে না সে ব্যয়ই সব থেকে বড় ক্ষতি। বর্তমান ব্যবস্থায় এই ক্ষতির পরিমাণ খুবই বেশী। শিক্ষণ-শিক্ষা-মহাবিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ে বহু অর্থব্যয়ে যেসকল শিক্ষককে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের বুনিয়াদী শিক্ষার কাজে নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। বহু ব্যয়ে যেসব বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে সেসকল বিদ্যালয়ও বুনিয়াদী শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তুলতে পারছে না। নানাবিধ অব্যবস্থার জন্য এসকল বিদ্যালয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতি জনসাধারণের মন বিরূপ করে তুলতেই সহায়তা করছে। এই ব্যবস্থায় এই অপচয় বন্ধ করা সম্ভব হবে।

(খ) এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করা আরম্ভ করলে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রারম্ভিক ব্যয় অনেক কমে যাবে। শিক্ষণ-শিক্ষা-বিভাগ সহ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় আরম্ভ করায় ব্যয় ২৫০০০৲ টাকার বেশী পড়বে না এবং এই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় প্রথমাবধিই দ্রুত স্বাবলম্বনের দিকে এগিয়ে যাবে।

অঞ্চলের অন্যান্য বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করার জন্য প্রারম্ভিক ব্যয় তিন হাজার টাকার বেশী পড়বে না। এরকম এক একটি বিদ্যালয়ের জন্য তিন হাজার টাকা করে তিন বছর ব্যয় করলেই যথেষ্ট হবে।

(গ) এই ব্যবস্থার ফলে শিক্ষণ-শিক্ষার ব্যয় অনেক কমে যাবে।

মহাবিদ্যালয়ে এক একজন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেবার বিরাট ব্যয়ের প্রশ্ন এখানে একেবারেই থাকবে না, অথচ এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থী-শিক্ষকরা অনেক বেশী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন।

(ঘ) এই ব্যবস্থায় বিদ্যালয় গড়ে তোলার বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা গ্রামবাসীর সহায়তা অধিকতর পরিমাণে পেতে পারব। ব্যয় সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আমরা পরে করব।

পরিদর্শন ঃ

বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা যেমন ত্রুটিপূর্ণ তার পরিদর্শন-ব্যবস্থাও তেমনি ত্রুটিপূর্ণ, একথা সকলেই স্বীকার করবেন। বলা যেতে পারে যে একান্ত ত্রুটিপূর্ণ পরিদর্শন-ব্যবস্থার জন্য বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষার যেটুকু উন্নতি হওয়া সম্ভব তাও হচ্ছে না। বর্তমান ব্যবস্থায় একজন পরিদর্শকের দায়িত্বাধীনে বিদ্যালয়ের সংখ্যা অত্যধিক। বিদ্যালয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা এবং তা দূর করার সহায়তা করা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তাঁর পরিদর্শন এবং পরিদর্শন-মন্তব্য শিক্ষার উন্নিতবিধানে অল্পই সহায়তা করে ; সরকারী ফাইলের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা ছাড়া এর সার্থকতা অতি অল্পই। পরিদর্শকদের সকল উৎসাহ ও কর্মক্ষমতা ফাইল ঘাঁটতেই নিঃশেষিত হয়। পরিদর্শন-মন্তব্যে তাঁরা যে উপদেশ দিয়ে থাকেন তা কেতাবী বুলি ছাড়া আর কিছুই নয় ; কারণ কোন শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ে প্রয়োগ ও পরীক্ষা করার কোন সুযোগ তাঁদের নেই। তাছাড়া, বর্তমান পদ্ধতিতে স্বীয় অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাবিষয়ক উন্নতিসাধনের কোন দায়িত্বই পরিদর্শকদের নেই। সুতরাং বিদ্যালয়ের ত্রুটিবিচ্যুতি নির্দেশ করেই

তাঁরা তাঁদের কর্তব্য সমাধান করেন, সেগুলি দূর করার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠেন না, আর হবার কোন সুযোগও তাঁদের থাকে না।

শিক্ষণ-শিক্ষাকে বিকেন্দ্রিত করে একজন শিক্ষাকর্মীর অধীনে ১৫টি বিদ্যালয়কে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করলে পরিদর্শন এবং শিক্ষণ-শিক্ষা একীভূত হয়ে যাবে। এর ফলে স্বীয় অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিকে গড়ে তোলার দায়িত্ব সর্বতোভাবে পরিদর্শকের উপরই এসে পড়বে—তিনিই হবেন একাধারে শিক্ষাদাতা, পরামর্শদাতা ও পর্যবেক্ষক। এ হলে তাঁকে প্রচুর পরিমাণে সক্রিয় হতে হবে। অধস্তন শিক্ষক-দের জীর্ণ-অজীর্ণ কতকগুলি উপদেশ বিতরণ করেই তিনি নিষ্কৃতি পাবেন না। কর্তৃত্বের শূন্যগর্ভ চেয়ারটি ছেড়ে তাঁকে প্রাথমিক শিক্ষকদের সহকর্মীর স্থান গ্রহণ করতে হবে, সকলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সমস্যার সমাধান তাঁকে করতে হবে। নিজের উৎসাহ, উদ্দীপনা, কর্মক্ষমতা দিয়ে তাঁকে শিক্ষকদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চারিত করতে হবে। নিজের উন্নততর কর্মক্ষমতা, সমস্যার সমাধানে তাঁর অনস্বীকার্য যোগ্যতা তাঁকে প্রমাণ করতে হবে হাতে-কলমে কাজ করে। তিনি যে উপদেশ দেবার অধিকারী সেটা তাঁকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে প্রত্যক্ষভাবে। এর ফলে আজ যে কর্মপ্রচেষ্টা চলছে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী কর্মপ্রচেষ্টা আমরা আশা করতে পারব শিক্ষাকর্মীদের কাছ থেকে। অপর দিকে ফাইলের অযথা চাপ অপসারিত হওয়ায় পরিদর্শকরা নিজেদের প্রতিভা, সংগঠন-শক্তি ও কর্মক্ষমতাকে পূর্ণভাবে কাজে লাগাবার সুযোগ পাবেন। আজ যে ফাইলের মুখোশের নীচে মানুষের স্বরূপটি চাপা পড়ছে তা থেকে মানুষ নিষ্কৃতিলাভ করবে। ব্যক্তিত্বের

বিকাশের এই পূর্ণ সুযোগই বিকেন্দ্রীকরণের নীতির মূলকথা। যাঁর শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু দান করার যোগ্যতা আছে এই ব্যবস্থার ফলে তিনি তাঁর সেই দানটি পূর্ণভাবে দেবার সুযোগ প্যাবেন; আবার যাঁর কিছু দেবার নেই তিনি ফাইলের বাক্‌চাতুর্যের আড়ালে নিজের অক্ষমতাকে ঢেকে রাখতে পারবেন না। এই ব্যবস্থার ফলে শিক্ষক ও পরিদর্শকের মধ্যে চোর-পুলিশের সম্পর্ক ঘুচে গিয়ে সহকারিতার সখ্য বিস্তার সম্ভব হবে এবং তার ফলে বুনিয়াদী শিক্ষার সার্থক প্রসারের জন্য যে পরিবেশটি একান্ত প্রয়োজন তার সৃষ্টি হবে। তা-ছাড়া, এই ব্যবস্থার ফলে পরিদর্শক তাঁর যোগ্যতার উপযুক্ত স্বীকৃতি লাভ করার সুযোগ পাবেন। কর্তৃপক্ষের ভাল লাগা মন্দ লাগা এবং কথার কারচুপির উপর তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ আর নির্ভর করবে না। জনসাধারণ এবং কর্তৃপক্ষ তাঁর কাজের বাস্তব রূপ দেখে তাঁকে বিচার করতে পারবেন। এই স্বীকৃতিলাভের সম্ভাবনা তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার পিছনে অন্তঃপ্রেরণা জোগাতে যথেষ্ট সহায়তা করবে।

এখানে একটি আপত্তি ওঠার সম্ভাবনা আছে। সেটি হচ্ছে এই যে পনেরটি বিদ্যালয়ের জন্য একজন পরিদর্শক নিযুক্ত করা আর্থিক কারণে কখনই সম্ভব হবে না। আমার ধারণা এই আপত্তিটি অগভীরচিন্তাপ্রসূত। প্রাথমিক শিক্ষা যে বর্তমান ব্যবস্থার জন্য প্রতিপদেই ব্যর্থ হচ্ছে তা আমরা অনুক্ষণই দেখতে পাচ্ছি। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয়িত কোটি কোটি টাকার অপচয়ই ঘটছে। কোটি কোটি টাকা অপচয় করা যে জাতির পক্ষে অসম্ভব নয় এই বিরাট অপচয় বন্ধ করার জন্য অর্থব্যয় করা সে জাতির পক্ষে অসম্ভব হওয়া উচিত নয়। তাছাড়া, দেশকে দ্রুত শিক্ষিত করার এবং

রাতারাতি শিক্ষার আমূল পরিবর্তনের মোহ থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিজেদের সাধ্য অনুসারে শিক্ষাবিপ্লবের পথে সুপরিকল্পিত উপায়ে এগিয়ে যাবার কথা যদি আমরা ভাবি, স্থির লক্ষ্য রেখে আমরা যদি ধীর এবং দৃঢ় পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলি তবে অর্থের জন্য অসুবিধা হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। শিক্ষাবিপ্লবের জন্য প্রয়োজন যোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি এবং নূতন দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন কর্মীদল ; এই দুটি বিষয়ে দৃষ্টি না দিয়ে কেবল ব্যাপকভাবে বিপ্লব সুরু করলে সে বিপ্লব-প্রচেষ্টা হাস্যকর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা তেমনি একটা প্রচেষ্টা সুরু করেছি। বুনিয়াদী শিক্ষা যে সমাজদর্শন, যে অর্থনীতি, যে জীবনাদর্শকে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত সেই আদর্শে শ্রদ্ধাশীল কর্মী বেছে নেবার চেষ্টা আমরা করিনি, যে পরিবেশ ও ব্যবস্থায় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার লাভ করতে পারে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করার দিকে আমরা মনোযোগ দিই নি এবং সেই ব্যবস্থাকে গ্রহণ করিনি ; অথচ সেই বিপ্লবের ধ্বনি তুলে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। এর ফলেই আমরা অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতার সম্মুখীন হচ্ছি। এই ব্যবস্থার জন্য অধিক অর্থের প্রয়োজন আছে কিনা সেটা পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা বিচার করব কিন্তু প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে যে এরকম বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থা ছাড়া, আর যাই সম্ভব হক, বুনিয়াদী শিক্ষার সার্থক প্রতিষ্ঠা ও প্রসার সম্ভব নয়।

ব্যয় ঃ

আমাদের দেশে যে চড়ায় ঠেকে শিক্ষার, বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষার, নৌকা বার বার ভরাডুবি হচ্ছে সে হচ্ছে অর্থাল্পতার

অজুহাত। বিদেশীরা যতদিন আমাদের দেশের শাসক এবং শোষক ছিল ততদিন শিক্ষার প্রসারকে তারা কিছুতেই ভাল নজরে দেখতে পারেনি ; সুতরাং শূন্য ভাণ্ডারের শিখণ্ডীকে সামনে খাড়া করে শিক্ষার প্রসারকে বাধা দেওয়া তাদের নিজেদের স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন ছিল। আজ সে অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে তার সুফল এখনও যথেষ্ট ফলতে আরম্ভ করেনি। স্বাধীনতা লাভের পর দেশগঠনের নানা ক্ষেত্রে আমরা বিরাট পরিকল্পনা খাড়া করেছি এবং তার জন্য কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ এবং ব্যয় করতে সুরু করেছি। সেসব ক্ষেত্রে ব্যয়ের সঙ্গে অপব্যয়ও প্রচুর হয়েছে ; সেজন্য আমাদের অনভিজ্ঞতাকে দায়ী করে আমরা ত্রুটি দূর করতে চেষ্টা করেছি, হতাশ হয়ে হাত গুটিয়ে নিইনি। বড় বড় নদী-উপত্যকার পরিকল্পনায়, কৃষি এবং সারের খাতে ব্যয়ের পরিকল্পনায় বিরাট পরিকল্পনার এবং বিপুল ব্যয় ও অপব্যয়ের প্রচুর দৃষ্টান্ত মিলবে। এসব পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য আমরা বিরাট ঋণের ঝুঁকি গ্রহণ করেছি এবং এগুলি যে জাতির জীবন-মরণের সমস্যা সেটা উপলব্ধি করে কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইনি।

দুর্ভাগ্যবশতঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই উপলব্ধি আমাদের আজও আসেনি। আমাদের বর্তমান শিক্ষায় বিজ্ঞানী তৈরী হয় না, ইঞ্জিনীয়ার তৈরী হয় না, ডাক্তার তৈরী হয় না, তৈরী হয় কেবল মাত্র কেরাণী, এ বোধ আমাদের আজও আসেনি। হাতে কলমে কাজ করতে, নিজের ইন্দ্রিয়গুলি সজাগ সচেতন ও সক্রিয় করে বিশ্বের পুঁথি থেকে শিক্ষালাভ করতে, নিজের বুদ্ধি ও শক্তির উপর নির্ভর করে নিজের সমস্যার সমাধান করতে আমরা শিখি না, আমরা শিখি

কেবল মাত্র পরের ভাষায় পরের বুলি মুখস্থ করতে এবং এই মুখস্থ করা বিদ্যা নিয়ে ভিখারীর মত পরের দুয়ারে চাকুরীর অন্বেষণ করতে। আমরা এখনও উপলব্ধি করিনি যে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবর্তন সম্ভব নয়, তার অনেক আগেই আমাদের দেশের ভাবী নাগরিকদের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়ে যায়। এই উপলব্ধির অভাবেই আমরা আজকাল বামপন্থী-বিক্ষোভের নামে চাকুরীপ্রত্যাশী মধ্যবিত্ত-দের যে বিদ্যারোমন্থন চলছে তার বিশ্লেষণ করতে পারছি না। অসহায়, ভীরু, কর্মক্ষমতাহীন, বাক্‌সর্বস্ব যুবশক্তিকে সংগঠনের কাজে নিয়োগ করতে হলে প্রথমাবধি শিক্ষাকে অন্য সুরে বাঁধতে হবে। শিক্ষা বিয়য়ে এই উপলব্ধির অভাবের আর এই ফল হচ্ছে জাতীয় গঠনকার্যের সর্বত্র অপব্যয়ের প্রাচুর্য। খাদ্য ফলাও আন্দোলনের নামে নানাপ্রকার ইস্তাহার ছাপানোতে আমরা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছি, কিন্তু খাদ্য যারা ফলাবে তাদের কাছে যে এগুলি অর্থহীন তা আমরা সম্যক উপলব্ধি করিনি। সমবায়-আন্দোলনকে গড়ে তুলতে আমরা অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করিনি, কিন্তু শিক্ষা ছাড়া গ্রামে গ্রামে যে এই সমবায়ের ভিত্তি গঠিত হতে পারে না তা আমরা যথেষ্ট ভেবে দেখিনি। জাতিকে সংগঠনের পথে নিয়ে যেতে এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতখানি তার সম্যক জ্ঞান রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর ছিল। এই প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি থেকেই গান্ধীজী প্রত্যেক বালক বালিকার সাত বছরের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার দাবী করেছিলেন এবং এই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্য দিয়েই বয়স্কগণকেও শিক্ষিত এবং সচেতন করে তুলতে চেয়েছিলেন।

গান্ধীজীর দাবীকে আমাদের জাতীয় সরকার স্বীকার করে

নিয়েছেন। কিন্তু পাঁচ বছর পরে আজ দেখছি যে এই স্বীকৃতি কার্যতঃ অনেকটা মৌখিক স্বীকৃতিই রয়ে গেছে, পুরানো সেই অর্থাল্পতার বুলিই আমাদের লক্ষ্যকে আড়াল করে রয়েছে। বিগত ১৫ই ও ১৬ই মার্চ দিল্লীতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা-সমিতির যে অধিবেশন হয়ে গেছে তাতে শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ স্বীকার করেছেন যে অর্থাল্পতার জন্য শিক্ষাপ্রগতি আশানুরূপ হয়নি। অর্থাল্পতার জন্য যদি দামোদর-উপত্যকা-পরিকল্পনা ব্যাহত না হয় তবে অর্থাল্পতার জন্য শিক্ষা-পরিকল্পনাও ব্যাহত হওয়া উচিত নয়, এ বোধ আমাদের জাগ্রত হবে কবে! জাতির দেহকে রক্ষা করার জন্য খাদ্য সেচ ইত্যাদি সংক্রান্ত পরিকল্পনা যতখানি প্রয়োজনীয়, জাতির আত্মাকে রক্ষার জন্য সার্বজনীন শিক্ষাও ততখানি প্রয়োজনীয়। দেহকে বাদ দিয়ে আত্মাকে রক্ষা করা যেমন অসম্ভব, আত্মাকে সুপ্ত রেখে দেহরক্ষার ব্যবস্থা করে কতকগুলি পশুকে বাঁচিয়ে রাখাও তেমনি নিরর্থক। আমরা সার্জেণ্ট সাহেবের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাদ দিয়ে ১৬ বছরের মধ্যে জাতির জন্য বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর স্বীকারোক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আমরা আশানুরূপভাবে অগ্রসর হতে পারিনি। শুধু তাই নয়, যেটুকু অগ্রগতির সংবাদ তিনি পরিবেশন করেছেন তা প্রধানতঃ কমিটি গঠন ও পরিকল্পনা গ্রহণের, কর্মযজ্ঞ আরম্ভের শুভ সূচনার নির্দেশ তাতে অল্পই আছে।

বুনিয়াদী শিক্ষাকে কার্যকরী করে তোলার সম্যক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কেবল ব্যয়ের প্রশ্নের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়নি বলেই তাকে দ্রুত কার্যকরী করা সম্ভব হচ্ছে না এরকম একটা ধারণা সর্বত্র

সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বে আমি এ বিষয়ে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাকর্মীর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করেছি। বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যয় সম্পর্কে তাঁর সমালোচনাটি শিক্ষিত সমাজের প্রায় সার্বজনীন অভিমত বলেই আমি মনে করি। এজন্য তাঁর উক্তিটিই পুনরায় উদ্ধৃত করে এই সমালোচনার উত্তর দিতে চেষ্টা করব। একটি পত্রে তিনি লিখেছেন: "বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যয়হিসাবে কোথাও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় নাই। ভবিষ্যতে যে হইবে সে সম্বন্ধে খুবই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। অথচ বুনিয়াদী শিক্ষালয় স্থাপন সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চাইতে অধিকতর ব্যয়বহুল। তাই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রসার দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। গান্ধীজী যে কারণে এই শিক্ষাপদ্ধতিকে আমাদের মত এই দরিদ্র দেশের সঙ্গে উপযুক্ত মনে করিয়াছিলেন, দেখিতেছি ঠিক সেই কারণেই উহা এখন ইহার প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

সর্বত্রই দেখি বুনিয়াদী শিক্ষা নামে যাহা কিছু চালু তাকেই গান্ধীজীর নামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। গান্ধীজী যে বুনিয়াদী শিক্ষার কথা বলেছিলেন, বুনিয়াদী শিক্ষাকে যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তা আমরা গ্রহণ করিনি অথচ আমরা আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা মত বুনিয়াদী শিক্ষার যে রূপ দিয়েছি তার অসাফল্যের বোঝা সর্বদাই গান্ধীজীর পরিকল্পনার উপর চাপাবার চেষ্টা করেছি। যে ব্যয়বহুল শিক্ষা-পরিকল্পনা সরকারীভাবে গৃহীত হয়েছে, তার সঙ্গে গান্ধীজীর পরিকল্পনার কোন যোগ নেই। গান্ধীজী চেয়েছিলেন, রাজ্যপালরা কুটীর তৈরী করে দৈন্য-দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের সঙ্গে তাদের সুখ-দুঃখের ভাগ নেবেন; তেমনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি

চেয়েছিলেন 'মহাত্মা মুচি, মহাত্মা কলু' গিয়ে গ্রামের শিক্ষকতার ভার নেবেন। আমরা সমাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর উপদেশকে গ্রহণ করতে পারিনি, তাই শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁর উপদেশ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালরা যেমন বিরাট প্রাসাদ, বিরাট জাঁকজমকের মধ্যে জনসাধারণ থেকে বহুদূরে রয়েছেন, বুনিয়াদী শিক্ষার কর্ণধারও তেমনি 'সুউচ্চ জীবনযাত্রার মানের' গণ্ডীর ভিতর প্রাথমিক-শিক্ষক এবং গ্রামের জনসাধারণ থেকে দূরে রয়েছেন; তাঁদের দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত লোভলোলুপ নেত্রে তাকিয়ে থাকা যায়, কিন্তু তাঁদের আদর্শ বলে গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং বুনিয়াদী শিক্ষার যে ব্যয়বহুল মাথাভারী কাঠামোটা আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার সঙ্গে গান্ধীজীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার কোন যোগ নাই। ব্যয়ের পথ আমরা ইচ্ছা করে বেছে নিয়েছি, সে পথে অগ্রসর হওয়া যদি সম্ভব না হয়, ব্যয়বাহুল্যের জন্য বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি যদি ব্যাহতই হয়, তবে সেজন্য গান্ধীজীর পরিকল্পনাকে দোষ দেবার কোন অধিকার আমাদের নেই। গান্ধীজীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষা প্রয়োজন হলে গাছতলায় সামান্য দু-চারটি গ্রাম্য সরঞ্জাম নিয়েও সুরু করা যায়। গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনাকে অর্থের অভাবে রূপ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, একথা বলার আগে তাঁর পরিকল্পনাকে পূর্ণভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। বস্তুতঃ গান্ধীজী যে অহিংস বিপ্লবের সাধনা করে গেছেন তা কোন ক্ষেত্রেই একান্তভাবে অর্থের উপর নির্ভরশীল নয়—এ বিপ্লবের জন্য প্রধান প্রয়োজন পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী ও নিষ্ঠাবান কর্মী। কাপড়ের কল তৈরী করে কাপড়ের সমস্যা মেটাতে হলে, পীচঢালা রাস্তা তৈরী করে যাতায়াতের সমস্যা

মেটাতে গেলে, ট্রাক্টর এনে খাদ্য-সমস্যার সমাধান করতে হলে আর্থিক পর-নির্ভরশীলতা অপরিহার্য; এজন্য গান্ধীজী চরকা ইত্যাদিকে সত্যকার সমাধান বলে নির্দেশ করেছিলেন। এতে অর্থের প্রয়োজন থাকলেও আর্থিক পরনির্ভরতা অপরিহার্য নয়। "আমাদের চিন্তাকে আজ পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়েছে। আমরা গান্ধীজীর পরিকল্পিত সমাজের আদর্শ ত্যাগ করি তো কথাই নাই। তা হলে সেই কথাই আমাদের স্পষ্ট করে বলা উচিত। নচেৎ এই সমাজের দিকে যদি আমাদের লক্ষ্য থাকে, তা হলে গান্ধীজীর শিক্ষা-পরিকল্পনাকে আমাদের পরিবর্তিত আকারেই গ্রহণ করতে হবে। তার খানিকটা বাদ দিয়ে খানিকটা রাখব, এ চলবে না।"*

বুনিয়াদী শিক্ষার আর্থিক দিক সম্পর্কে যে দুটি সমস্যাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে, তা হচ্ছে: (১) প্রারম্ভিক ব্যয়বাহুল্য, (২) বুনিয়াদী শিক্ষার আর্থিক স্বাবলম্বন সম্পর্কে সংশয়। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষার আর্থিক দিক সম্পর্কে একটা বিষয় প্রায়ই আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়—সেটা হচ্ছে অপচয়ের প্রশ্ন। অপচয়কে বজায় রেখে অর্থের পূর্ণ সদ্ব্যবহার কিছুতেই সম্ভব নয়। আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে এই তিনটি বিষয় নিয়েই আলোচনা করব।

বুনিয়াদী শিক্ষার আর্থিক সমস্যার সমাধান সম্পর্কে একটি প্রস্তাব

অপচয় ও তার দূরীকরণ:

যে কোন ব্যাপারেই অর্থব্যয় করা এক কথা আর সেই অর্থের

* পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বুনিয়াদী-শিক্ষা-উপসমিতি কর্তৃক প্রকাশিত "বুনিয়াদী শিক্ষা" শীর্ষক পুস্তিকা—১২ পৃষ্ঠা।

সদ্ব্যয় সম্পূর্ণ অন্য কথা। যে অর্থব্যয় আদর্শকে রূপায়িত হতে সহায়তা করে না, বরং বিপরীত মনোভাব এবং অবস্থা সৃষ্ট হতে সহায়তা করে, সে ব্যয় অপব্যয়। অপব্যয় কখনই আদর্শপ্রতিষ্ঠার সহায়ক হতে পারে না।

বুনিয়াদী শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে অহিংস সমাজের জন্য যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলা। বর্তমান সমাজে ঐশ্বর্য যত বাড়ছে কাড়াকাড়ি হানাহানিও ততই বাড়ছে। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে আমাদের শিক্ষা আমাদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতার মনোভাবকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, ভালমন্দের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে আমরা সবাইকে ছাড়িয়ে বড় হবার চেষ্টায় মেতে আছি। অর্থের প্রয়োজন কি আমাদের ভাববার সময় নেই, আমরা অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত ; মোটর গাড়ীর প্রয়োজন আছে কি নেই সেকথা ভাবা নিরর্থক, একটা মোটর গাড়ীর মালিক হবার নেশায় আমরা মত্ত। 'আরও চাই, আরও চাই'এই হয়ে উঠেছে আমাদের মন্ত্র, চাই কি না তার ভাবনা ভাবা নিষ্প্রয়োজন। সকলকে ছাড়িয়ে বড় হবার নেশা, অন্যের কথা না ভেবে নিজে ভোগ করার নেশা আমাদের এমনিভাবে পেয়ে বসেছে যে, এর মধ্যে অন্যায় কিছু, নিন্দনীয় কিছু আছে তা বুঝতেও আমাদের কষ্ট হয় ; আমরা একান্ত সততার সঙ্গেই চিন্তা করতে শিখেছি যে, এ ছাড়া কোন উন্নতি বা প্রগতিই সম্ভব নয়। এর ফলে আজকার সমগ্র সভ্যতাটাই গড়ে উঠেছে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, জাতিতে জাতিতে ক্ষমাহীন প্রতিযোগিতার ভিত্তির উপর, আর তার অবশ্যম্ভাবী বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে সঞ্চয়ের জন্য কাড়াকাড়ি, ভোগের জন্য হানাহানি,

জাতিতে জাতিতে নিত্যবিরোধ। এই পরিবেশের পরিবর্তে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা বুনিয়াদি শিক্ষার লক্ষ্য যাতে হিংসা-বিদ্বেষের এই কালিমা থাকবে না। এর জন্য এমন শিক্ষা জনমনে সঞ্চারিত করতে হবে যার ফলে মানুষ সকলকে ছাড়িয়ে বড় হওয়ার পরিবর্তে সকলকে নিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছানোকে শ্রেষ্ঠতর বলে মনে করবে, নিজের শক্তিকে সকলকে হারিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় নিয়োগ করার পরিবর্তে ঐ শক্তিকে দীনতম, সবচেয়ে অসহায় মানুষের সেবায় নিয়োগ করাকে অধিকতর কাম্য মনে করবে।

এজন্য বুনিয়াদী শিক্ষার সংগঠন এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে প্রতিযোগিতার নিরর্থক সুযোগ না থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য যে অর্থব্যয়িত হচ্ছে, তা এই পরিবেশ সৃষ্টির বা এই মনোভাব গড়ে তোলার সহায়ক হচ্ছে না। বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে ৩৫০-১২০০ টাকা মাসিক মাইনের চাকরে আছেন, ২০০—৮০০ টাকা মাসিক মাইনের চাকরে আছেন, ২০০—২২৫ টাকা মাসিক মাইনের চাকরে আছেন। এঁদের যোগ্যতারও যে খুব বিশেষ তারতম্য আছে তাও না, আর প্রয়োজন দেখে মাইনের ব্যবস্থা করা তো সম্ভবই নয়। একই যোগ্যতা নিয়ে হয়তো একজন ভাগ্যবান মাইনের সিঁড়ির উপরের ধাপে বসে আছেন, আর একজন রয়েছেন নীচের ধাপে। ফলে প্রতিযোগিতা, সন্দেহ, বিদ্বেষের আবহাওয়া সংক্রমিত হবার সকল ব্যবস্থাই হয়ে রয়েছে। কাজকে সার্থকতার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমবেত চেষ্টার বদলে তাই বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রেও দেখছি চাকরীতে উন্নতি করার জন্য প্রতিযোগিতার আতিশয্য। অপর পক্ষে এঁরা সবাই বুনিয়াদী

শিক্ষার মেরুদণ্ড যে শিক্ষক তাঁদের চাইতে এত বেশি মাইনে পেয়ে থাকেন যে, প্রাথমিক-শিক্ষকদের দুঃখ-বেদনা উপলব্ধি করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। অসামঞ্জস্য যেখানে এত বিরাট সেখানে সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। প্রাথমিক-শিক্ষকরা দৈন্যের ঊর্ধ্বে না থাকলে তাঁদের পক্ষে নিজ নিজ শক্তির পূর্ণ প্রয়োগ করে কাজ করা অসম্ভব। এই অবস্থার মধ্যে শিক্ষার কোন উন্নতি সম্ভব নয় ; আর তা না হলে এ খাতে যত অর্থই ব্যয়িত হোক না কেন, তা অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা যত বেশী চাকরীর থাক তৈরী করেছি, যত বেশী উচ্চপদের সৃষ্টি করেছি, ততই বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠা ব্যাহত হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষাকে সার্থক করতে হলে গান্ধীজীর সমবণ্টনের নীতিকেও স্বীকার করে নিতে হবে। শিক্ষাকে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করলে চলবে না, তাকে মানুষের সেবায় নিয়োগ করাকেই ধর্ম বলে শিখতে হবে। সুতরাং বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থের এই অপচয়কে দূর করতে হলে (১) শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে আর্থিক অসাম্য যথাসম্ভব দূর করতে হবে এবং তাদের পারিশ্রমিককে জাতির উপার্জন-সীমার কাছাকাছি আনতে হবে। (২) প্রাথমিক-শিক্ষকদের বেঁচে থাকার মত ন্যূনতম পারিশ্রমিক দেবার ব্যবস্থা করতে হবে ; আর সরকার যদি তা না পারেন, তবে শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব থেকে তাঁদের প্রকাশ্যভাবে নিষ্কৃতি নেওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে যে-রকম কেন্দ্রীকরণ রয়েছে তাও বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠার সহায়ক নয়। বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য বিকেন্দ্রীকরণ। শিক্ষা ব্যাপারে বুনিয়াদী

শিক্ষার লক্ষ্য জ্ঞানের আশীর্বাদকে প্রতেকটি ঘরে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় সংগঠন, অর্থ, কর্মী, সরঞ্জাম, পুস্তকাদি সর্ব বিষয়েই কেন্দ্রীকরণ চলছে। এসব খাতে ব্যয় যত বাড়ছে, বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠাও ততই ব্যাহত হচ্ছে। গ্রামে গ্রামে বই নেই, সরঞ্জাম নেই, কর্মী নেই ; আর আমরা কয়েকটি কেন্দ্রে এগুলি কেন্দ্রীভূত করছি। কি করলে বিকেন্দ্রিত সংগঠন গড়ে উঠতে পারে এবং কি করে তা দ্বারা একটি শিক্ষালয়ের বদলে একটা সমগ্র অঞ্চল উপকৃত হতে পারে তা আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। ওই কার্যসূচী গ্রহণ করলে বর্তমান ব্যবস্থায় প্রচুর অর্থব্যয় করে ক্রমাগত আদর্শকে ব্যাহত করার যে আশঙ্কা রয়েছে তা আমরা দূর করতে পারি।

তৃতীয়তঃ পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে, বর্তমান ব্যবস্থায় সুষ্ঠুভাবে শিক্ষক-নির্বাচন, তাঁদের পরীক্ষা করা এবং তাঁদের কর্মে নিয়োজিত করা সম্ভব নয়। এজন্য শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার জন্য এবং তাঁদের বৃত্তি দেওয়ার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে তার অনেকটাই অপচয় হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষণশিক্ষা-মহাবিদ্যালয়ে এক-একটি শিক্ষার্থীকে শিক্ষিত করে তুলতে সরকারের ব্যয় হয় ৫০০০৲ টাকার মত। গত তিন বছরে পশ্চিমবঙ্গের দুটি বুনিয়াদী শিক্ষণশিক্ষা-মহাবিদ্যালয়ে প্রায় ১৮০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা-লাভ করেছেন। এর মধ্যে বড় জোর ৩০ জন বুনিয়াদী শিক্ষার কাজে নিযুক্ত আছেন। অর্থাৎ এ-খাতে যত ব্যয় হয়েছে তার শতকরা ১৭% ভাগেরও কম বুনিয়াদী শিক্ষার কাজে লেগেছে। মেয়েদের বুনিয়াদী শিক্ষণ-শিক্ষাদানের ব্যাপারেও এই একই ঘটনার

পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। পূর্ণ সংখ্যা এখনও পাইনি বটে, কিন্তু যতটা পেয়েছি তাতেই দেখতে পাচ্ছি যে, বিভিন্ন শিক্ষণ-শিক্ষা-বিদ্যালয়ে যে শিক্ষকরা শিক্ষালাভ করছেন, তাঁদের একটা বেশ বড় সংখ্যা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন না। অনেকে বুনিয়াদী শিক্ষা নেবার পর সাধারণ বিদ্যালয়ে কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। এঁরা সরঞ্জামের অভাবে শিখে-আসা-বিদ্যাকে কাজে লাগাতে পারছেন না অথচ উপযুক্ত সহায়তা ও পরামর্শের অভাবে সাধারণ বিদ্যালয়ের পরিবেশে বুনিয়াদী শিক্ষার সহায়ক পরিবেশও সৃষ্টি করতে পারছেন না। বুনিয়াদী শিক্ষার খাতে এজন্য যে সকল ব্যয় হয়েছে তার সবটুকুকেই অপচয় বলা চলে। তা ছাড়া বর্তমান ব্যবস্থায় আমরা অনেক নূতন শিক্ষার্থী-শিক্ষককে বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষিত করছি অথচ যাঁরা প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে রয়েছেন তাঁদের যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষালাভ করার সুযোগ দিতে পারছি না। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে দ্বিধা ও ঢিলেমি উপজাত হয়েছে তা শিক্ষার রূপান্তর সাধনকে জটিলতর করে তুলেছে।

চতুর্থতঃ বিচ্ছিন্নভাবে বুনিয়াদী বিদ্যালয় গড়ে তোলার ফলে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রভাব সমাজের উপর খুব কমই পড়ছে। বারটি জায়গায় বারটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় গড়ে তোলার চাইতে একটা অঞ্চল জুড়ে বারটি বিদ্যালয় স্থাপন করলে বুনিয়াদী শিক্ষার উৎকর্ষ সহজে প্রমাণ করা সম্ভব। বিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যালয় গড়ে তোলার খরচ ঠিকই হচ্ছে, কিন্তু পরিবেশের চাপে শিক্ষাটাই বিকৃত হয়ে যাচ্ছে।

এ সকল অপচয় দূর করতে হলে যে-রকম সংগঠন, শিক্ষণ-ব্যবস্থা, অঞ্চলিক ভিত্তিতে বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিদর্শন ব্যবস্থা

প্রয়োজন বলে মনে করি তা আগেই আলোচনা করেছি। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় পরিদর্শন ব্যাপারে অধিকতর অর্থব্যয়ের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়, শিক্ষকদের জন্য অর্থব্যয়ও এই ব্যবস্থায় অধিকতর করতে হবে। কিন্তু একটা কাজকে রূপ দেবার জন্য দশ টাকা যদি যথেষ্ট না হয় তবে ঐ ব্যাপারে দশ টাকা ব্যয় করে ঐ অর্থের অপচয় করার চাইতে ঐ কাজ সাধ্যের বাইরে বলে ত্যাগ করা ভাল। বুনিয়াদী শিক্ষার বহু ক্ষেত্রে ব্যয়-সঙ্কোচের সুযোগ যে আছে, তা আমি বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা করেছি। সে সকল ব্যয়-সঙ্কোচ করা অপরিহার্য। অপর পক্ষে উপরোক্ত দুটি খাতে যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন রয়েছে বিরাট অপচয় দূর করার জন্য—সেখানে কার্পণ্য করলে সমগ্র উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য। কিন্তু এজন্য যে বুনিয়াদী শিক্ষার খাতে অধিকতর অর্থব্যয় করাটাই বড় কথা তা নয়। শিক্ষার জন্য যতটা ব্যয় করা জাতির পক্ষে সম্ভব তা করতেই হবে; কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, সে অর্থের সদ্ব্যয় করতে হবে। যে আর্থিক ব্যয় করার সামর্থ্য আমাদের আছে তাতে যদি যতটা ব্যাপকভাবে আমরা কাজ সুরু করেছি ততটা ব্যাপকভাবে কাজ করা সম্ভব না হয়, তবে কাজের ব্যাপকতা আমাদের কমাতে হবে; কিন্তু যতটা কাজ করা হবে তা যদি সার্থকভাবে করা না হয়, তবে সমগ্র প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে।

প্রারম্ভিক ব্যয়ঃ

বলা হয়ে থাকে, বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক ব্যয় সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যয়ের চাইতে ঢের বেশী। গান্ধীজীর চিন্তাধারা অনুসারে বিচার করতে গেলে এই মন্তব্যকে

ঠিক বলে মেনে নেওয়া চলে না। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সরকারী পরিকল্পনা অনুসারে একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রারম্ভিক ব্যয় ধরা হয় ৩২,০০০্ টাকা। এই পরিকল্পনার সঙ্গে গান্ধীজীর পরিকল্পনার কোন যোগই নেই। বহু সহস্র টাকা ব্যয় করে সরকার বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য যে ঘরবাড়ী তৈরী করেছেন তেমন ঘরবাড়ী প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য তৈরী করা সরকারের সাধ্যাতীত তা সরকার স্বীকার করেন। সেক্ষেত্রে কতকগুলি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ঘরবাড়ী তৈরী করার জন্য এরূপ অর্থব্যয়ের কোন নীতিগত অধিকার সরকারের আছে কি না, তাও সন্দেহের বিষয়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকার যে অর্থ সংগ্রহ করেন, তা প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য সমভাবে বণ্টন করা সরকারের দায়িত্ব। সরকারকে জাতির প্রতিটি শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সমান সুযোগের সৃষ্টি করতে হবে। সে ক্ষেত্রে যে ব্যয় প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের জন্য করা সম্ভব নয় বলে সরকার স্বীকার করেন সে ব্যয় কতকগুলি বিদ্যালয়ের জন্য করার অধিকার সরকারের আছে কি? সরকার বিপুল ব্যয়ে নির্মিত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের এই বাড়ীগুলিকে জাতির সামনে আদর্শ বললেও বলতে পারেন না; কারণ টিন, সিমেণ্ট প্রভৃতি উপকরণগুলি স্থানীয় সরঞ্জাম নয় এবং গ্রামের লোক ইচ্ছা করলেও নিজেদের শ্রম ও সামর্থে তাঁদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য সরকার-পরিকল্পিত বাড়ীগুলির মত বাড়ী তৈরী করতে পারবেন না।

গান্ধীজীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রত্যেক গ্রামের জন্য। তেমন বিদ্যালয়ের জন্য বহুমূল্য ঘরবাড়ী, বহুমূল্য সরঞ্জামের কিছুমাত্র

প্রয়োজন নেই। স্থানীয় উপকরণে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ঘরবাড়ী এবং সরঞ্জাম প্রস্তুত করা সম্ভব না হলে গান্ধীজীর পরিকল্পনাকে কিছুতেই রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। স্থানীয় উপকরণে যদি ঘরবাড়ী তৈরী করা সম্ভব হয় তবে অর্থব্যয়ের প্রশ্ন অবান্তর। জাতির নিরাপত্তার জন্য প্রত্যেককে সৈন্যদলে যোগদান করতে সরকার বাধ্য করতে পারেন, জাতির মঙ্গলের জন্য প্রাণবলি দিতে সরকার তার প্রত্যেক নাগরিককে বাধ্য করতে পারেন। শিক্ষাকে যদি সরকার জাতির সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের ভিত্তি বলে মনে করেন তবে শিক্ষালয় গড়ে তোলার জন্য উপকৃত অঞ্চলের প্রত্যেকটি লোককে বৎসরে কয়েকদিন শ্রম করতে বাধ্য করা কি সরকারের পক্ষে অসম্ভব? গ্রামের প্রত্যেকে ঘর তৈরীর জন্য কিছু-না-কিছু শ্রম করতে পারেন এবং শুধু এই শ্রম দ্বারাই গান্ধীজীর পরিকল্পিত বুনিয়াদী বিদ্যালয় গড়ে উঠতে পারে। প্রয়োজন হলে এ-রকম বিদ্যালয় গাছতলায়-ও সুরু করা যায়। বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিও এইভাবেই গ্রামের শ্রমে রচিত। বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘরবাড়ীর সঙ্গে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের যে একটি তফাত থাকবে তা এই যে, এখানে শ্রমের সঙ্গে জ্ঞানের সংযোগ ঘটবে। বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘরবাড়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্ধকূপ। এ বিদ্যালয় ঘরগুলি টাকা-আনার হিসাবে খানিকটা সুলভ হলেও এগুলির মধ্যে কাজ করার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়; সুতরাং এই বিদ্যালয়গুলিতে আলোহাওয়ার পথের সঙ্গে সৃষ্টি ও উপার্জনের পথও বন্ধ। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান সংস্করণের ঘরবাড়ী-গুলির সবচেয়ে মারাত্মক ত্রুটি যা, তা হচ্ছে এই যে, এখানে

জাতীয় স্বাস্থ্যের যে অপচয় ঘটে তাকে টাকা-আনার হিসাবে কষলে অঙ্কটা কল্পনাতীতভাবে বিরাট হয়ে উঠবে।

সরঞ্জামের দিক থেকেও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ব্যয় বিরাট হবার কথা নয়। বসবার জন্য কোন বেঞ্চ বা ডেস্কের প্রয়োজন নেই। ছাত্রেরা নিজেদের বসবার আসন নিজেরাই তৈরী করে নেবে। বাঁশ বা কাঠ যে-কোন উপকরণ দিয়ে ৫ম-৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রেরা সমস্ত বিদ্যালয়ের জন্য বই ইত্যাদি রাখবার বা লিখবার ডেস্ক প্রভৃতি তৈরী করতে পারে। অফিসের জন্যও কেনা সরঞ্জামের বাহুল্য ত্যাগ করা যায়। গান্ধীজী যে সকল শিল্পকাজ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করার উপর জোর দিয়েছেন তার জন্যও কোন বিরাট প্রারম্ভিক ব্যয়ের প্রয়োজন নেই। তূলা ছাত্রেরা নিজেরাই তৈরী করে নিতে পারে, তকলী কেনার সামর্থ্য প্রত্যেক ছাত্রেরই আছে; স্থানীয় উপকরণে বাঁশের বা কাঠের চরকা ও তাঁত তৈরী করাও ব্যয়বহুল নয়। চাষের কাজের সরঞ্জাম প্রত্যেক গ্রামেই আছে এবং দরকার হলে গ্রামের এ সকল সরঞ্জামকেই বিদ্যালয়েও ব্যবহার করা চলে।

টাকা-পয়সার দৃষ্টি দিয়েও যদি হিসাব কষি তবু দেখতে পাব, বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিরাট ব্যয়ের প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি, তা বহুলপরিমাণে কমানো সম্ভব। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য প্রথমেই সব ঘরবাড়ী তৈরী করার প্রয়োজন নেই। ৩০০ বর্গ ফুট মাপের দুটি-কোঠাযুক্ত চারদিকে ৬ ফুট বারান্দা দেওয়া মাটির দেয়াল ও টালির ছাদযুক্ত একটি ঘর তৈরী করে নিলেই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করা যায়। সরকারের সমবায়-

বিভাগ গ্রামে টালি তৈরীর শিল্পকে গড়ে তুলতে সহায়তা দিলে কম দামে উৎকৃষ্ট টালি কিংবা খাপরা প্রত্যেক গ্রামেই সহজলভ্য হতে পারে। এরকম একটি বাড়ী তৈরী করার জন্য ৩০০০৲ টাকার বেশী খরচ হওয়া উচিত নয়। বারান্দাকে ঘিরে নিয়ে সাময়িকভাবে অফিস ও ধুনাই-ঘরের কাজ চালিয়ে নেওয়া চলবে। বছরে এরকম একটি করে ঘর তৈরী করে নিলেই তিন বছরে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় যথেষ্ট ঘরবাড়ী তৈরী করা সম্ভব হবে। প্রত্যেক বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের জন্য ঘরবাড়ী তৈরী করা নিরর্থক। দূর গ্রাম থেকে শিক্ষক এনে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না। তবে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের জন্য কিছু ঘরবাড়ীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হবে, কারণ খুব সাবধানে এবং বেছে নিয়ে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্বাচন করতে হবে। স্থানবিশেষে সাধারণ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্যও বাইরের শিক্ষক দু-একজন নির্বাচন করা প্রথমে প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু সে সকল ক্ষেত্রে গ্রামের মধ্যেই শিক্ষকদের বসবাসের ব্যবস্থা করা সমীচীন হবে। এ বিষয়ে সরকারী ব্যয় যে নিরর্থক হয়েছে তা বিভিন্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়সংলগ্ন শিক্ষকদের জন্য নির্মিত শূন্য বাড়ীগুলি দেখলেই বোঝা যায়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য প্রচুর সরঞ্জামই বড় কথা নয়; উপযুক্ত সরঞ্জাম প্রয়োজন। বুনিয়াদী বিদ্যালয় কাজ করার জায়গা, সেখানে অকেজো যন্ত্র জঞ্জালমাত্র। অনেক বিদ্যালয়ে এমন সরঞ্জামও দেখেছি যার ব্যবহার শিক্ষকরাও জানেন না; আবার অন্যত্র এমন সরঞ্জামও দেখেছি যেগুলি কেবলমাত্র সাজিয়ে রাখাই চলে, ব্যবহার করা চলে না। এ খাতে তিন বৎসর বৎসরে

৫০০৲ টাকা করে ১৫০০৲ টাকা খরচ করলেই যথেষ্ট। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পানীয় জল ও সেচের জন্য ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই খাতে স্থানবিশেষে ৫০০৲ থেকে ১০০০৲ টাকা ব্যয় হওয়া সম্ভব।

সুতরাং এই প্রস্তাব অনুযায়ী বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রারম্ভিক ব্যয় হিসাবে প্রথম বৎসরে নিম্নলিখিত ব্যয় প্রয়োজন হবে :

ঘরবাড়ী তৈরী	...	৩০০০৲
সরঞ্জাম	...	৫০০৲
জলের ব্যবস্থা	...	১০০০৲
মোট	......	৪৫০০৲

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরের ব্যয় :

ঘরবাড়ী তৈরী	...	৩০০০৲
সরঞ্জাম	...	৫০০৲
বিবিধ	...	৫০০৲
মোট		৪০০০৲ × ২ ৮০০০৲
সর্বমোট		১২৫০০৲

সুতরাং সর্বমোট তের হাজার টাকার মধ্যে একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা অবশ্যই সম্ভব। সর্বত্র এত অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হবে না, কোথাও হয়তো একটু আধটু বেশীও খরচ হতে পারে। বর্তমান প্রারম্ভিক ব্যয়ের সঙ্গে এই ব্যবস্থার স্পষ্টতঃ তফাত রয়েছে। এই ব্যবস্থায় এক সঙ্গে সমস্ত অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন হবে না, তিন বৎসরে ব্যয় করতে হবে। তা ছাড়া এই ব্যয়ের সমস্তটাই গ্রামকে সমৃদ্ধ করবে, ধনী ঠিকাদার কিংবা বিদেশী ব্যবসায়ীর পকেট এই অর্থে স্ফীত হবে না। তৃতীয়তঃ এই ব্যয়ের অংশ গ্রামবাসীর পক্ষে বহন

করা সহজ হবে, কারণ অর্থটাই এখানে প্রধান কথা হবে না—শ্রমদান এই ব্যবস্থাকে সার্থক করে তুলতে পারবে।

এরকম বিদ্যালয় বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিষ্ঠা করে কোন লাভ হবে না, সে কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন শিক্ষণশিক্ষা-বিভাগকে কেন্দ্র করেই এক-একটি অঞ্চলে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অনূর্ধ্ব ১৫টি বিদ্যালয়কে নিয়ে এক-একটি অঞ্চল সংগঠিত করা যেতে পারে উপযুক্ত লোক নির্বাচন করলে এরকম একটি শিক্ষণকেন্দ্র শিক্ষণশিক্ষা-বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় উভয়েরই কাজ করতে পারে। এতে শিক্ষার্থী শিক্ষকদের পিছনে মাথাপিছু শিক্ষার খরচ খুবই কমে যাবে এবং একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর বুনিয়াদী শিক্ষার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

শিক্ষণশিক্ষা-বিভাগ সহ একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে নিম্নলিখিত ব্যয় হওয়া সম্ভব ঃ

কেন্দ্রীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ঘরবাড়ী	...	৯০০০৲
শিক্ষণশিক্ষা-বিভাগের ঘরবাড়ী	...	৪০০০৲
ছাত্রাবাস, গোশালা ইত্যাদি অন্যান্য ঘরবাড়ী	...	৫০০০৲
শিক্ষকদের জন্য গৃহ নির্মাণ (তিনটি)		৬০০০৲
সেচ ও চাষের ব্যবস্থা	...	২০০০৲
বস্ত্র-শিল্পের সরঞ্জাম	...	১০০০৲
শিক্ষাবিষয়ক বিবিধ সরঞ্জাম	...	১০০০৲
অন্যান্য শিল্প-সরঞ্জাম	...	১০০০৲
গ্রন্থাগার	...	১০০০৲
মোট	...	৩০,০০০৲

এই ব্যয় সম্পর্কে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের সরঞ্জাম এবং গ্রন্থাগার সমগ্র অঞ্চলের বিদ্যালয়-গুলিকে সহায়তা দিতে পারবে। এতে বর্তমানে শিক্ষণকেন্দ্রগুলিতে পুস্তক এবং সরঞ্জামের যে স্তূপীকরণ ঘটছে তার সমাধান হবে। দ্বিতীয়তঃ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাপ্রগতি আজকাল যেভাবে সরঞ্জাম ও বইয়ের অভাবে ব্যাহত হচ্ছে তা বন্ধ হবে। তৃতীয়তঃ এই ব্যবস্থার ফলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জমিগুলির সদ্ব্যবহার সম্ভব হবে এবং বর্তমান খাদ্য সম্পর্কিত জাতীয় দুর্দিনে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জমিগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকেজো পড়ে থাকায় যে লজ্জাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা দূর হবে।

এই হিসাব মত দেখা যাবে যে যেখানে বর্তমান ব্যবস্থায় ১৫টি বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে ২৪,০০০৲ × ১৫ = ৩,৬০,০০০৲ টাকার প্রয়োজন হয়, সেখানে এই প্রস্তাবানুযায়ী কাজ হলে সমগ্র অঞ্চলের শিক্ষকদের শিক্ষণ-ব্যবস্থাসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ ১৫টি নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয় সংগঠন করতে ৩০,০০০৲ + ১২,৫০০৲ × ১৪ সর্বমোট ২,০৫,০০০৲ টাকা প্রয়োজন হবে। মোট ৩,৬০,০০০৲ টাকার পরিবর্তে ২,০৫,০০০৲ টাকা ব্যয় করে একই পরিমাণ কাজযদি অধিকতর সার্থকতার সঙ্গে করা যায় তবে বিষয়টি নিশ্চয়ই আমাদের গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে।

আর্থিক স্বাবলম্বন :

গান্ধীজীর মতে আর্থিক স্বাবলম্বন বুনিয়াদী শিক্ষার কষ্টিপাথর। শিক্ষামূলক শিল্পকাজের মধ্য দিয়ে যতক্ষণ ছাত্র আর্থিক স্বাবলম্বন অর্জন করতে না পারবে অর্থাৎ যতক্ষণ সে তার শিক্ষার সমগ্র ব্যয় উৎপাদনাত্মক কাজের ভিতর দিয়ে উপার্জন করতে না পারবে ততক্ষণই তার বুনিয়াদী-শিক্ষাকাল। এইজন্য গান্ধীজী বলেছেন : "আমার বিয়ে তো সাত বছরের সঙ্গে হয়নি, হয়েছে স্বাবলম্বনের সঙ্গে।" শিক্ষার মধ্য দিয়ে আর্থিক স্বাবলম্বন এলেই গান্ধীজীর মতে বুনিয়াদী শিক্ষার শিক্ষাকাল শেষ হল, তা সে সাত বছরেই হক আর ন বছরেই হক। এই শিক্ষাকালটি একটি অখণ্ড শিক্ষাকাল হওয়া চাই। ৬ থেকে ১৪ বৎসর পর্যন্ত এই আট বৎসরের শিক্ষাকাল যে একটা অখণ্ড শিক্ষাকাল হওয়া প্রয়োজন, শিক্ষার দিক থেকে এই প্রয়োজনীয়তার দিকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা-সমিতি বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমরা বুনিয়াদী শিক্ষার আর্থিক স্বাবলম্বনের সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করছি কিন্তু গান্ধীজীর নির্দেশিত পথে কোন সুসম্পূর্ণ পরীক্ষাই আমরা এখনও করিনি। সম্পূর্ণভাবে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কোন পরীক্ষা না করে গান্ধীজীর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র হবে।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ছাত্রদের উৎপাদিত দ্রব্যের গুণ এবং পরিমাণ অনেকখানি বেড়ে যায়। ঐ শ্রেণী থেকে বয়ন এবং কৃষির কাজ আরম্ভ হওয়ায় প্রত্যেক ছাত্রের

আয় ৫ম শ্রেণীর তুলনায় কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমরা অন্যত্র করেছি।* তাই ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকেই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য ব্যয়ের চাইতে আয় বেশী হতে থাকে। অথচ অর্থাভাবের যুক্তি দেখিয়ে ঠিক এই সময়টাতেই সরকারী বুনিয়াদী-শিক্ষাব্যবস্থায় একটা ছেদ টানা হয়েছে। এ সম্পর্কে হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ জাকির হোসেনের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা আর ব্যয়িত অর্থ জলে ফেলে দেওয়া একই কথা। যে সরকার ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন তাঁরা ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা আর্থিক কারণে করতে পারেন না, একথা তিনি স্বীকার করেননি। তাঁর মতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয় খোলার মত অর্থ থাকলে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয় গড়ার অর্থের অভাব হতে পারে না। শিক্ষানৈতিক এবং অর্থনৈতিক উভয়বিধ কারণে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয় অর্থহীন। বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে আর্থিক স্বাবলম্বনের দিকে নিয়ে যেতে হলে আটশ্রেণীবিশিষ্ট বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করতেই হবে।

দ্বিতীয়তঃ অধিকসংখ্যক শিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা আর্থিক স্বাবলম্বনের পথে বাধা। অনেক শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে কোন শিল্পই ভাল করে শেখা হয় না। ফলে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ ও উৎকর্ষ দুটোই থাকে নীচু স্তরের। সীমাবদ্ধ আর্থিক সামর্থ্যের দরুণ প্রয়োজনীয় উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। তা ছাড়া সময়ের স্বল্পতাও শিক্ষণীয় শিল্পকে যথাযোগ্যভাবে আয়ত্ত

* বুনিয়াদী শিক্ষা ও স্বাবলম্বন—বুনিয়াদী শিক্ষার কথা ২য় খণ্ড।

করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শিল্প শেখার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা-সমিতি যে সময়সূচীর নির্দেশ দিয়েছেন ততটুকু সময় সার্থক শিল্পশিক্ষার জন্য ব্যয় করা একান্ত প্রয়োজন। সমিতির মতে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্পকাজের জন্য ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীতে দৈনিক ২ ঘণ্টা, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীতে দৈনিক ২½ ঘণ্টা, এবং ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে দৈনিক ৩ ঘণ্টা সময় দেওয়া দরকার।* এতটা সময় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিল্পশিক্ষার জন্য দেওয়া হয় না।

তৃতীয়তঃ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের সঙ্গে যদি একটি সরঞ্জাম-কার্যালয় যুক্ত থাকে তবে বুনিয়াদী শিক্ষার আর্থিক স্বাবলম্বন আরও খানিকটা সহজে হতে পারে। শিল্প-কাজে অপব্যয়ের পরিমাণ কমিয়েও আমরা লক্ষ্যে পৌঁছানোকে অনেকটা সহজ করে তুলতে পারি।

বুনিয়াদী শিক্ষাকে আর্থিক দিক দিয়ে স্ববলম্বী করে তোলার একটি প্রধান অন্তরায় হচ্ছে বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো। বর্তমান সভ্যতায় অন্ন সৃষ্টি করে বেঁচে থাকার মজুরী পাওয়া কঠিন, কিন্তু নেশার খোরাক সৃষ্টি করে বড়লোক হওয়া যায়। এই অসুবিধা সম্পর্কে আমরা অন্যত্র বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।† কিন্তু এ কথা ঠিক যে বর্তমান শিক্ষায় যেখানে কেবলমাত্র খরচের অঙ্কই দেখা যায় সেখানে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আয়ও হবে। এই আয় একেবারে নগণ্য নয়। অতি সহজে একটি বিদ্যার্থী গড়ে মাসে একটি টাকা উপার্জন করতে পারবে। সুতরাং ভারতবর্ষে যদি প্রত্যেকটি শিশু বুনিয়াদী

* Syllabus for Basic School—Bureau of Education, India, Pamphlet No. 70. pp. 11

† বুনিয়াদী শিক্ষা ও স্বাবলম্বন—শিক্ষাব্রতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭

শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ করে তবে প্রতি বৎসর এই শিক্ষার্থীরা ন্যূনপক্ষে ষাট কোটি টাকার দ্রব্য উৎপাদন করবে। আমাদের মত গরীব দেশের পক্ষে এই আয় উপেক্ষণীয় নয় নিশ্চয়ই। কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা-সমিতি তাঁদের বিগত ১৫ই ও ১৬ই মার্চের সভায় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উৎপাদনাত্মক কাজের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবার সুপারিশ করছেন। আশা করি, তাঁদের এই সুপারিশ প্রত্যেক শিক্ষাকর্মী ও রাজ্যসরকারগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

নঈ তালিমে বয়স্কশিক্ষা

নঈ তালিমের মূল কথা হচ্ছে এই যে শিক্ষার কোন শেষ নেই। কয়েকটি পুঁথি পড়েই শিক্ষার শেষ হয় না। জীবনকে, সমাজকে সুন্দর করে তুলতে হলে সমগ্রজীবনব্যাপী সাধনার প্রয়োজন। জন্মক্ষণ থেকে মৃত্যুমুহূর্ত পর্যন্ত এই শিক্ষাসাধনা চলতে থাকে। এজন্য নঈ তালিমের ব্যাপ্তি জীবনব্যাপী।*

নঈ তালিমে বয়স্কশিক্ষার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। নঈ তালিমের লক্ষ্য কেবলমাত্র সংবাদ বিতরণ নয়; নঈ তালিমের লক্ষ্য এক সমাজবিপ্লব, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এবং জীবনযাত্রাকে এক নূতন আদর্শে গড়ে তোলা, এক নূতন পথে পরিচালিত করা। বয়স্কদের সচেতন ও সক্রিয় সহায়তা ছাড়া এ আদর্শের রূপায়ণ কিছুতেই সম্ভবপর নয়। আইন করে, দেশের সমগ্র ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করে একনায়কসুলভ আচরণের দ্বারা একটা বাহ্যিক পরিবর্তন আনা হয়তো সম্ভব; কিন্তু যতদিন শিক্ষার প্রভাবে জনচিত্তে নূতন আদর্শের বীজ অঙ্কুরিত না হয়, যতদিন মানুষ নূতন করে দেখতে ও ভাবতে না শেখে ততদিন কোন আদর্শের

---

* "The scope of Basic Education includes the education of the whole of society beginning with the children and going upto adults and old men and women. It has to be imparted through the practice of handicrafts, village sanitation and medical relief, preventive and curative, specially with regard to deficinency diseases."—Gandhiji : Speech while receiving the purse of the Kasturba Gandhi Memorial Trust.

রূপায়ণই সম্ভব নয়। গান্ধীজীর পরিকল্পিত অহিংস সমাজবিপ্লবকে রূপায়িত করার জন্য, কোটি কোটি গ্রামকে সুখী সমৃদ্ধ স্বাস্থ্য-সম্পন্ন শোষণশৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য তাই বয়স্কদের নঈ তালিমের পদ্ধতিতে শিক্ষাদান অত্যাবশ্যক।*

বয়স্কশিক্ষার জন্য নঈ তালিমের কর্মীদের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক-ভাবে প্রচেষ্টার সুরু হয় ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর থেকে। ঐ দিন হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের সভায় জি. রামচন্দ্রন্‌কে আহ্বায়ক করে একটি প্রৌঢ়শিক্ষা-উপসমিতি গঠিত হয়। এই উপসমিতির কাজ ছিল ১২ বৎসরের অধিকবয়স্ক অশিক্ষিতদের জন্য শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করা। এক কথায় এই উপসমিতির লক্ষ্য হয় শিল্পকাজ এবং অন্যান্য সৃজনাত্মক ও মনোরঞ্জক কাজের মধ্য দিয়ে বয়স্কদের শিক্ষিত করে তোলা যাতে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে এবং সমাজের অঙ্গ হিসাবে অধিকতর সুখী সমৃদ্ধ এবং পরিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারেন।†

* "It is my dream that in a few years. there will be real wealth in our villages and the villagers will be clean and healthy, peaceful and happy. If this is not so, I shall understand that there is something wrong with our work in Nai Talim."—"Twelve Years of Work" published by Hindusthani Talimi Sangha, p. 8.

† "The aim and object of Adult Education is to educate the village adults to lead a better, fuller and richer life, both as individuals and as social units. This education should be imparted through some suitable rural handicaft and other creative and recreative activities." Twelve Years of Work published by Hindusthani Talimi Sangh p. 7.

প্রৌঢ়শিক্ষার ব্যাপকতর কাজ হাতে নেবার সময় গান্ধীজী কর্মীদের বলেছিলেন যে কি করে কর্মীরা এগিয়ে যাবেন, কি করে এই কাজকে সার্থক করবেন সেই সম্পর্কে কোন হদিসই তিনি দিতে পারবেন না, কেবল একটি সঙ্কেত ছাড়া। তিনি বলেন যে নঈ তালিমের কর্মীদের এগিয়ে যাবার পথে একটি মাত্র ধ্রুবতারা আছে—সে হচ্ছে গ্রাম শিল্প। * গান্ধীজীর এই বাক্যটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। গান্ধীজীর মতে বর্তমান কালের সকল অত্যাচার এবং শোষণ, দারিদ্র এবং দুঃখের মূল রয়েছে ক্ষমতা ও উৎপাদনের কেন্দ্রীকরণের মধ্যে। বিরাট যন্ত্রশিল্পের মধ্যেই দুর্নীতির বীজ নিহিত রয়েছে। বৃহৎ যন্ত্রের এবং কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার সত্যিকারের সামাজীকরণ সম্ভব নয়। এর ফলে মুষ্টিমেয় বুদ্ধিমানের খপ্পরে গিয়ে পড়তেই হবে সংখ্যাহীন জনসাধারণকে। এর ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হয় তার বাহ্যিক পরিবর্তন সাধন সম্ভব কিন্তু আমুল পরিবর্তন সম্ভব নয়। এজন্য গান্ধীজীর মতে একমাত্র কুটির শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষাই মানুষকে কেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার প্রভাবমুক্ত হবার শক্তি দিতে পারে। এতে এক দিকে যেমন মানুষের ব্যক্তিত্ব ও শিল্পপ্রতিভা উৎকর্ষ লাভ করবে, তেমনি তার জীবন হয়ে উঠবে শোষণমুক্ত ও সমৃদ্ধ। এ সম্পর্কে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি।†

---

* 'There we have no guide except the pole-star. That pole-star is village handicafts." Opening speech, All India Education Conference at Sevagram in January 1945.

† বুনিয়াদী শিক্ষার কথা, ২য় খণ্ড—"বুনিয়াদী শিক্ষায় শিল্প কাজ" এবং "বুনিয়াদী শিক্ষা ও ভাবী সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধ।

গান্ধীজীর মতে সাক্ষরতা তাই প্রৌঢ়শিক্ষার মুখ্য বিষয় নয়। তাঁর মতে শিক্ষার্থীকে শেখাতে হবে পূর্ণভাবে বাঁচতে। অশিক্ষা যে তার ভালভাবে বেঁচে থাকার পথের অন্তরায়, তার কাজের উন্নতির পথের বাধা এ বোধ শিক্ষার্থীর মনে জাগ্রত করা চাই। যে কাজের দ্বারা শিক্ষার্থী তার জীবিকা উপার্জন করে সে কাজের মধ্যে অশিক্ষাজনিত কি ত্রুটি আছে, সে সব ত্রুটি কি করে দূর করা যায় তা শিক্ষককে খুঁজে বের করতে হবে; আর এই সব ত্রুটি দূর করার চেষ্টাই হবে প্রৌঢ়শিক্ষার প্রধান মাধ্যম। * অবশ্য সাক্ষরতাকে নঈ তালিমে প্রৌঢ়শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে এবং অক্ষরজ্ঞানকে যথাসময়ে এবং যথোচিত ভাবে কাজে লাগাবার কথা বলা হয়েছে; তবে নঈ তালিমে কোথাও অক্ষরজ্ঞানকে শিক্ষার আরম্ভ অথবা মূল উদ্দেশ্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়নি।

নঈ তালিমে বয়স্কশিক্ষা বলতে কি বোঝায় তার একটা সুস্পষ্ট ধারণা আমরা পাই হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের প্রৌঢ়শিক্ষা-উপসমিতি ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনের সামনে যে

---

* "অগর হম প্রৌঢ়-শিক্ষা সে খেল ন করকে উসে গম্ভীরতাকে সাথ হাতমেঁ লেনা চাহতে হৈঁ তো হমেঁ দো বুনিয়াদী বাতোঁ কো মান লেনা হোগা। এক তো য়হ কি প্রৌঢ়শিক্ষা মেঁ সয়ানোঁ কো পূরী তালিম মিলনী চাহিএ, জিসসে বে এক জ্যাদা রেহরঃ, সম্পূর্ণ ঔর সমৃদ্ধ জিন্দগী বিতা সকেঁ; ঔর দুসরী য়হ কি য়হ তালিম সির্ফ উসী কামকে অন্দর ঔর উসী কে জরিএ দী জা সকতী হৈ জিসমে কি উসকা সারা জীবন ব্যতীত হোতা হৈ।" সমগ্র নঈ তালিম—হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ ...পৃষ্ঠা ২০৩

প্রস্তাবগুলি রেখেছিলেন তার মধ্যে। এই প্রস্তাবগুলিতে বলা হয়েছে যে ঃ

১। কেবলমাত্র সাক্ষরতা নয় পরন্তু সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাই প্রৌঢ়-শিক্ষার উদ্দেশ্য।

২। প্রৌঢ়শিক্ষা প্রধানতঃ কোন উৎপাদনমূলক কাজের মাধ্যমে দেওয়া হবে।

৩। বয়স্কশিক্ষার কর্মীকে শিক্ষার্থীদের বাড়ী বাড়ী বা কর্মক্ষেত্রে যেতে হবে তাদের কাজের সময়। সে সব কাজের বৈজ্ঞানিক রূপ কি হতে পারে তা জানতে হবে, বুঝতে হবে। আবার শিক্ষার্থীদের যখন অবসর থাকবে তখন তাঁদের একত্র করতে হবে তাঁদের ঐসব কাজের ত্রুটি, বৈজ্ঞানিক রূপ এবং উন্নতর কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য। এভাবে তাঁরা যে কাজ করে জীবিকা উপার্জন করেন তার বৈজ্ঞানিক রূপ কি হবে, কিভাবে কাজটা করলে তাঁরা লাভবান হতে পারবেন তা তাঁদের শেখাতে হবে।

৪। চাক্ষুষ শিক্ষার (visual education) পূর্ণ প্রয়োগ করতে হবে।

৫। শিক্ষার্থীর উপর লেখাপড়ার বোঝা না চাপিয়ে প্রধানতঃ মুখে মুখে শেখাতে হবে। লেখাপড়াকে অবশ্য অবজ্ঞা করা চলবে না—যথাসময়ে এবং যথোচিতভাবে আক্ষরিক শিক্ষার প্রয়োগ করতে হবে।

৬। পাঠ্যক্রমের অন্যান্য মুখ্য বিষয় হবে ঃ ব্যক্তিগত ও গ্রাম সাফাই, নাগরিকতা শিক্ষা, মৌলিক অধিকার এবং গ্রামবাসীর

সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় আইন সম্পর্কে জ্ঞান, শারীরশিক্ষা, খাদ্যবিজ্ঞান, নির্দোষ এবং স্বাস্থ্যকর মনোরঞ্জক কাজ, সন্তানের প্রতি মাতাপিতার কর্তব্য, সামাজিক সংগঠন ও সহকারিতা, পৃথিবী সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান, গ্রামের উৎসব অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা ও এই সব উৎসবের যথাযথ সংগঠন, গ্রামের বিভিন্ন দ্রব্যের যথাযোগ্য ব্যবহার, খারাপ অভ্যাস এবং কাজ থেকে কেন এবং কিভাবে দূরে থাকতে হবে সে সম্পর্কে জ্ঞান। তবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বেলায় প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, যে সব ধর্মীয় অনুষ্ঠান বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদের কারণ হতে পারে তা পরিহার করতে হবে এবং যে সব অনুষ্ঠান প্রীতি এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্য-সৃষ্টির সহায়ক তারই প্রয়োগ করতে হবে।*

উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি থেকেই নঈ তালিমে বয়স্ক শিক্ষার ধারা কি হবে সে সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। নঈ তালিমের সকল পর্যায়েই দুটি জিনিষের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে (১) উৎপাদনাত্মক কাজ হবে শিক্ষাদানের মূল মাধ্যম, (২) শিক্ষাদাতাকে শিক্ষা দিতে হবে নিজে কাজ করে আদর্শ দেখিয়ে, বক্তৃতা দিয়ে নয়। সুতরাং কাজ না শিখে কেবল মাত্র বক্তৃতা দিতে যারা অভ্যস্ত হয়েছেন তাঁদের পক্ষে নঈ তালিমের পদ্ধতিতে প্রৌঢ়শিক্ষার কাজ করা সম্ভব নয়। নঈ তালিমের কর্মীকে কর্মের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই প্রস্তুত হতে হবে। গ্রামের মধ্যে গ্রামবাসীদের পক্ষেও অনায়াসলব্ধ জিনিষ দিয়েই, কেবলমাত্র শিক্ষার গুণে, সুন্দরতর জীবন যাপনের

* সমগ্র নঈ তালিম—২০৫ পৃষ্ঠা

আদর্শ স্থাপন করতে হবে। এজন্যই গান্ধীজী বলেছেন নঈ তালিমের কর্মীকে হতে হবে এক একজন মহাত্মা কামার, কুমার অথবা কলু। গ্রামেরই কোন একটা শিল্পকে অবলম্বন করে জীবিকা উপার্জন করবেন; কিন্তু শিক্ষার গুণে তিনি সেই জীবিকাকে করে তুলবেন লাভজনক, জীবনকে করে তুলবেন সুন্দর। এরই ফলে গ্রামের লোক তাঁর কাছে আসবে পরামর্শ নিতে, সহায়তা পেতে। এই সহায়তা ও পরামর্শের মধ্য দিয়েই তিনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে সঞ্চারিত করবেন গ্রামবাসীদের মধ্যে। শিক্ষকের অন্যান্য আত্মপ্রস্তুতি ও প্রারম্ভিক কাজ সম্পর্কে আমরা পূর্ববর্তী প্রবন্ধে আলোচনা করছি।

আজকাল দেশের নিরক্ষরদের দ্রুত সাক্ষর করে তোলার একটা আন্দোলন ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে। সরকারী বয়স্কশিক্ষার এটাই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য। যে দেশে শতকরা ৮০ জন লোক সম্পূর্ণ নিরক্ষর সে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে এই আন্দোলনের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। সরকার অবশ্য সাক্ষরতার পরবর্তী শিক্ষার দ্বারা এই শিক্ষাকে পূর্ণতর করতে চাইছেন। কিন্তু সাক্ষরতার দিকে অতিরিক্ত জোর দেওয়ার একটা মারাত্মক কুফল আছে। নিরক্ষর লোককে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করা যত সোজা, সবেমাত্র অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করা তার চাইতে ঢের বেশী সোজা। ভ্রান্ত তথ্যে পূর্ণ ইস্তাহার দিয়ে তাদের ঢের বেশী সহজে ভোলানো যায়, সেগুলি ছড়ানোও খুব সোজা। ফলে সবেমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশকে আত্মপ্রস্তুতির জন্য, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার

জন্য যেভাবে সংগঠিত হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। রাজনৈতিক দলাদলি, সংকীর্ণ স্বার্থপরতার ক্রীড়নক হয়ে দেশকে সবল করার পরিবর্তে এই শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা দেশকে দুর্বলই করে তুলেছে।

এজন্য গান্ধীজী শিক্ষার, আত্মগঠনের বেলায় কোন সোজা রাস্তাকে স্বীকার করেননি। নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বোঝা, নিজের কাজকে বিচার করতে এবং উন্নত করতে শেখা, পরের কবলমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে মর্যাদাবোধ নিয়ে বাঁচতে শেখা, নিজের পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থাকে সুন্দরতর এবং উন্নততর করতে পারা—এ হচ্ছে শিক্ষার ন্যূনতম প্রয়োজন। এর চাইতে কম শিক্ষা কেবলমাত্র 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' হতে পারে মাত্র, ব্যক্তিগত এবং জাতীয় জীবনের মানকে উন্নীত করতে পারে না। নঈ তালিমে বয়স্কশিক্ষা মানে এই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা। কেবলমাত্র নৈশ-বিদ্যালয় খুলে অক্ষরজ্ঞান দেওয়ার মধ্য দিয়ে এ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়।

সমাপ্ত

ওরিয়েণ্টের শিক্ষা-নীতির বই

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা ১২